# এক ‘দালাল’-এর স্বীকারোক্তি

# এক ‘দালাল’-এর স্বীকারোক্তি

আজিজুল হক

আজকাল

**এক ‘দালাল’ এর স্বীকারোক্তি**

**Ak ‘Dalal’ er swikarokti**

an essay by Ajijul Haque

প্রথম প্রকাশ

বইমেলা, জানুয়ারি ২০১০, মাঘ ১৪১৬

প্রচ্ছদ

**দেবব্রত ঘোষ**

© আজিজুল হক

ISBN 978-81-7990-116-8

প্রকাশক

**জ্যোতিপ্রকাশ খান**

আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

বি পি ৭, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১

মুদ্রণ

ইউনিক কালার প্রিন্টার

২০ এ পটুয়া টোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

**৮০ টাকা**

উৎসর্গ নয়

**গঙ্গাজলেই গঙ্গাপুজো করা আমার অভ্যাস:**

এই রাজনৈতিক চৌর্যবৃত্তির সময়ে আজও রূপালি রেখা (ত্রিপুরার) বৈদ্যনাথ মজুমদার, বিজন ধর, মানিক সরকার এবং অনিল সরকারকে, তাঁদের অভিভাবকত্বে পরিচালিত জনগণের জন্য। এই আকালেও তাঁরা স্বপ্ন বুনে চলেছেন.....

# ভূমিকা

## কথার মৃত্যু নেই

‘বোল, কেঁউ লব আজাদ হ্যায় তেরে
বোল, জবান অব তক তেরি হ্যায়,
তেরা সুতওয়ান জিস্‌ম্‌ হ্যায় তেরা —
বোল, কেঁউ জান অবতক তেরি হ্যায়,
দেখ কেঁউ আহনগর কি দুকান নে
তুন্দ হ্যায় সূলে, সুরখ হ্যায় আহম,
খুলনে লাগে ব্বাফ্‌লোঁ কে জাহানে,
ফিলা হরেক জিঞ্জির কা দামন,
বোল, এ থোড়ি ওয়াক্ত বহূত হ্যায়,
জিসম ও জবান কী মওত সে পহলে,
বোল কে সচ জিন্দা হ্যায়, অবতক —
বোল যো কুছ কহনা হ্যায়, কহ্‌ লে।’

*(ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ)*

বলো, বলে নাও কারণ এখনও তোমার ঠোঁট দুটো মুক্ত আছে। বলতে থাকো কারণ এখনও তোমার জিহ্বাটা তোমারই আছে। এখনও তো তোমার ঋজু দেহটার মালিক তুমি নিজেই, এখনও তুমি জীবিত আছো, চেয়ে দ্যাখো, কামারের দোকানে হাপর জ্বলছে, আগুনের শিখা থেকে ফুলকি উড়ছে, দ্যাখো, শেকলটার প্রত্যেকটা গ্রন্থির মুখটা খুলে যাচ্ছে, শেকলটা গলছে ....

বলো, এখনও সত্য বেঁচে আছে। বলে নাও, যা বলার আছে বলে নাও, জীবনের এই অল্প সময়টা কিন্তু যথেষ্ট, বলার জন্য যথেষ্ট!

আমাদের কবি লিখেছেন, ‘মানুষের আয়ুতে ষাটের কোটা অস্তদিগন্তে হেলে পড়া। অর্থাৎ উদয়ের দিগন্তটা এই সময় সামনে এসে পড়ে, পূর্বে, পশ্চিমে মুখোমুখি হয়। জীবনের মাঝবয়সে যে কালটাকে পরিণত বয়স, সেই সময় অনেক বড় বড় সঙ্কল্প, অনেক কঠিন সাধনা, অনেক লাভ, অনেক মস্ত লোকসান এসে জমেছিল। সব জানিয়ে ভেবেছি এইবার আসা গেল পাকা পরিচয়ের কিনারাটাতে।..... কেউ বললে নেতা হও, কেউ বললে সভাপতি হও, কেউ বললে, ‘উপদেশ দাও’ আবার কেউ বললে, ‘দেশটাকে মাটি করতে বসেছ’ অর্থাৎ স্বীকার করলে দেশটাকে মাটি করে দেওয়ার মতো অসামান্য ক্ষমতা আমার আছে.....

'দালাল' 'দালাল' শুনতে শুনতে ভাবতে লাগলাম মানুষ জানুক না এক 'দালালে'র কথা, যে দালাল টাকার জন্য কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা দলের নয়, দালালি করে গেল একটা মতাদর্শ, একটা দর্শন, একটা রাজনীতির। 'পরিবর্তনে'র নামে দেশটাকে বিক্রি করতে উদ্যত কতগুলো জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ, মিরজাফররা। সেখান থেকে টাকা কামাতে উদ্যত কতগুলো 'বুদ্ধিজীবী' নামক বৃহন্নলা, তারা নাটক, গান, চলচ্চিত্র নিয়ে বাজারে নেমেছ। সৃজনের নামে লাম্পট্য চালিয়ে যাচ্ছে, তার লাম্পট্য গ্রামাঞ্চলে জমিদার নামক মানুষখেকোগুলো সংবিধান সিদ্ধ হয়ে উঠে পড়ে লেগেছে কৃষক উচ্ছেদে! খুনি পুলিস অফিসারগুলো জোট বাঁধছে.... প্রশ্ন হল একটাই: দালাল হবে, নাকি মিরজাফর হবে। উচ্ছেদ হওয়া কৃষকের হয়ে দালালি করবে নাকি জোতদারদের খতম না করে, খুনি পুলিসকর্তাদের শেষ না করে হার্মাদ মানে সি পি এম বিরোধিতার নামে কৃষক উচ্ছেদে মদতকারী, পুঁজিবাদীকে উদ্ধার পাওয়ার রাস্তা তৈরি করবে 'মাওবাদে'র নামে, লাল না গেরুয়া অথবা সবুজ?

সুমন কবীর নিজের স্বপক্ষে গান গেয়ে বেইমানি মানে জোতদারদের ফিরে আসার যুক্তি দিয়েছেন, সোজা বক্তব্য: Wind is knocking at window-pan! 'I change my name, my faith and religion'. তার দক্ষিণী জানালাতে বাতাসের গুঞ্জন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, তাই সে দক্ষিণী হাওয়াতে নাম, বিশ্বাস, ধর্ম পরিবর্তন করে নিল, জীর্ণ পাতার মতো ঝরে গেল। যুক্তিটাও আছে 'চোরের যুক্তি', সেটা কি? তুমিও তো পাল্টে গেছ! যা উদ্ধৃতি দিতে, যা বলতে, যা করতে, তুমিও তো সেটা নেই! মানে আমার বিশ্বাসে, মস্তিষ্ক জগতে সৎ থাকাটা তোমার ওপর নির্ভরশীল! তার কাছে মনে হয়েছে চোরের পরিবর্তে খুনিরা শ্রেয়! চোরেদের মদত দেওয়ার চেয়ে পাল্টে গিয়ে খুনিদের শক্তিবৃদ্ধি করে ভেতরের প্রবৃত্তি পশুর রক্ত পিপাসাটা মেটানো..... তারই নাম 'পরিবর্তন'।

এদের 'ইতিহাস' আছে, যে নাট্যকার কয়েক মাস আগে বুদ্ধদেবকে দেশের সবচেয়ে বড় সংস্কৃতিমনস্ক শিল্পী দরদি মুখ্যমন্ত্রী (তাপস সেনের স্মরণসভাতে বিভাস চক্রবর্তী), এই তোষামোদে বিগলিত মুখ্যমন্ত্রীও নার্সিংহোমের পথে, রোগীদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নিজের ক্ষমতাবলে একটা জায়গা দিয়ে দিলেন তাঁকে নাট্যকর্মশালা গড়তে। শুধু তাই নয়, গ্রাম থেকে নির্বাচিত দুজন সাংসদের (বাসুদেব আচার্য এবং আর একজন) তহবিল সেখানে ঢেলে দিলেন — পারিতোষিক! হুঁকোবরদারের পারিতোষিক! সেটা এখন কার্যত গেস্ট হাউস! এর চারমাস পরে যখন দেখলেন গুড়ের ভাঁড়ের ঢাকনা খুলে গেছে অন্য দোকানে মাছির মতো উড়ে গিয়ে ভন ভন করতে লাগলেন, 'বুদ্ধদেবের হাতে রক্ত লেগে আছে, খুনি!' ভন ভন করেই চলেছেন, একন পঞ্চাশ হাজারি চাকর! এক অসভ্য মুর্খস্য মূর্খ-অসংস্কৃত মহিলার সেবাদাস! নাট্যকার-চাকুরিজীবী! বলতে হবে না? এখন দেহে আছে প্রাণ, যে-কটা লোক পড়ে, বলতে হবে সেই দেড়ল-চিত্রকরের কথা যে লোকটা কল্যাণী উৎসবে, বুদ্ধদেবের হাত থেকে খসে পড়া কোঁচাটা আক্ষরিক অর্থে হেঁট হয়ে তুলে তার হাতে দিয়েছিল হাজার হাজার মানুষের সামনে, সে যখন দাড়ি নেড়ে বুদ্ধকে খিস্তি

করে.... মনে করিয়ে দিতে হবে না তরুণ প্রজন্মকে যে বুদ্ধবাবুর ব্যক্তিগত কল্যাণেই উনি এখনও ৪২০ এবং ৩০২ (খুন) ধারাতে জেলে পচছেন না? যতই নামডাক থাকুক, কার ব্যাটনে এঁরা বাঁদর নাচ নাচছেন। ৬২ সালে আনন্দবাজারের নেতৃত্বে যে মুক্ত সমাজ গড়ে উঠেছিল, তারাই আজ 'স্বজন' সুশীল হয়ে আবার ময়দানে অবতীর্ণ। সেই কাগজের নেতৃত্বেই। এখন যেখানে বর্তমান নামক কাগজের অফিস নামক প্রাসাদটি, সেখানকার হাজারখানেক অধিবাসীকে কেমন করে উচ্ছেদ করা হয়েছে? আদিবাসী মানুষদের বাস্তুভিটে আর হাড়ের ওপর গড়ে ওঠা প্রাসাদ (জ্যোতি বসুর কল্যাণে) যখন জঙ্গলমহলের জন্য কাঁদে, মনে হবে না, চিৎকার করে বলি, কিনছেন কিনুন, না হলে অতগুলো লোক খাবে কি? ঘরে যদি কুকুর, বেড়াল পায়খানা করে সেটা মোছার কাজে লাগান! বেশ কাজের! এখনও ঠোঁট দুটো নড়ছে, জিহ্বা অসাড় হয়ে যায়নি, তাই 'বোল, আজিজ, বোল!'

মানুষকে ব্যক্তিগুলোর মতাদর্শ (তরল, পাত্র অনুযায়ী পরিবর্তনশীল) না বুঝিয়ে, চেপে রেখে এদের পায়ে অর্ঘ্য দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করার পাপের ফল দেখাতে হবে না?

'শতপুষ্প বিকশিত হোক' মহান এই স্লোগানটির আড়ালে সত্যিকারের ফুলবাগিচাতে বেড়ে উঠতে লাগল বিষ-আগাছা! ভাল মালির মতো আগাছাগুলোকে নিড়েন দিয়ে ফেলে দেওয়ার জটিল কাজটি না করে তাদের গোড়াতেই জল সিঞ্চন করার ফল ফলছে! ফুলগুলো কীটদষ্ট! বাংলার সংস্কৃতির জগতে লোভ-লালসা আর নৈরাজ্যের দাপট। নন্দনে চলতে থাকে 'টরাস', অনুচ্চারিত গোর্কি, টলস্টয়, এমনকি হেমিংওয়ে, রলাঁও। ঝলমল করে মার্কুইজ গেন! সেকেলে নাকি এঙ্গেলস, জর্জ থমসন, দেরিদার আড়ালে লেনিনের মূর্তি ভাঙার যুক্তি, শ্রেণী, শ্রেণীস্বার্থ কথাগুলো মস্তিষ্ক থেকে দূর করার দর্শন ইতিহাস....!

বলতে হবে, হেঁকে বলতে হবে, 'তোমার অন্যায়েই জেনো এ-অন্যায় হয়েছে প্রবল', দায়িত্ব নিতে হবে, ফুলগুলোকে বাঁচাবার, ফুলের দালালি করি আমি। ড্রাগের পেডলার নই। তাই শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ে জেলে বন্দী থাকার সময়ে যে লেখাটি গোপনে পাচার করে পাঠিয়েছিলাম, তখন প্রকাশিত হয়েছিল গোপনে, সেটি আবার ছাপিয়ে দিলাম। ছাপিয়ে দিলাম, ওই সময়েই নেহরুর শতবর্ষ নিয়ে লাল ঝান্ডা দুলিয়ে যারা কমরেড নেহরু করছিল, তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য নেহরু প্রধানমন্ত্রী হয়ে কমিউনিস্টদের কোন চোখে দেখতেন তার দলিল। দেশকে আমেরিকা এবং পাশ্চাত্যের কাছে বন্ধক রাখার বীজ বপন হয়েছিল সেদিনই।

স্বপ্ন খেকো গনগনে চিতাকে মুক্তিসূর্য বলে চিৎকার করছে ওরা কারা? স্বামীহারা, পুত্রহারাদের হাহাকারকে পাখির কূজন বলে গেলাতে চাইছে ওরা কারা?

ওরা রসিক নয়/রাসায়নিক/কীসের সঙ্গে কী মেশালে/কোলে ঝোল টানা যায়/ওরা বিলক্ষণ জানে! তাই বোল মেরে জবান বোল! বলে যাও আজিজ, বলে যাও!

আজিজুল হক
৭ নভেম্বর, ২০০৯

## প্রথম পর্ব

## ‘দারিদ্র্যের মূল্য বেশি লুপ্তমূল্য ঐশ্বর্যের চেয়ে’

‘স্বপ্ন বড় নাছোড়বান্দা, থাকতে চায় না তাকে
পান্তাভাতে জড়িয়ে থাকে, থাকে কলমি শাকে’... (শুভেন্দু মাইতি)

শত্রুর নাম বিষণ্ণতা, শত্রুর নাম আত্মসন্তুষ্টি, শত্রুর বাসা মস্তিষ্কে, শত্রুর অস্ত্র ‘নিজেকে বদলে নাও’ স্লোগান! জীবনের তিন কুড়ি পাঁচ বছর পেরিয়ে ঘাড়টা ঘুরিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে যখন চালিয়ে দিই, দেখতে পাই ফেলে আসা দুনিয়াটা, এ কী দুনিয়া ফেলে যাচ্ছি:

একি আত্মবিস্মরণ মোহ,
বীর্যহীন ভিত্তি পরে কেন রচে শূন্য সমারোহ...
রাজ্যহীন সিংহাসনে অত্যুক্তির রাজা
বিধাতার সাজা,...

আজও ছুটে যাই, ক্লান্ত শরীর, শ্রান্ত মন উপেক্ষা করে ছুটি ওই হোথা। হোক-না সে বিহার, ঝাড়খণ্ড, আসাম কিংবা ত্রিপুরা, ওই হোথা।

‘হোথা যারা মাটি করে চাষ
রৌদ্রবৃষ্টি শিরে ধরি বারোমাস,
ওরা কভু আধা মিথ্যা রূপে
সত্যরে তো হানে না বিদ্রূপে।
ওরা আছে নিজস্থান পেয়ে
দারিদ্র্যের মূল্য বেশি লুপ্তমূল্য ঐশ্বর্যের চেয়ে’...

ষোলো বছর বয়স থেকেই কাটিয়েছি ওদের সঙ্গে, ওদের নিয়েই কত কথা:

‘প্রচণ্ড সত্যরে ভেঙে গল্প রচে অলস কল্পনা
নিষ্কর্মার স্বাদু উত্তেজনা
নাট্যমঞ্চে ব্যঙ্গ করি বীরসাজে
তারস্বরে আস্ফালনে উন্মত্ততা করে কোন লাজে’

নির্ঘাত হার্মাদ দালাল! না হলে গল্পকার, নাট্যকার এদের এরকম বলে? ছিঃ ছিঃ আজিজুলদা, তুমি এসব লিখলে? কথা হচ্ছিল, মানে তাকে কবিতা শোনাচ্ছিলাম এক ঘেটো-সংস্কৃতির ফেরিওয়ালা কাগজের সম্পাদক এবং তাঁর সঙ্গী ধনী ব্যবসায়ীর সঙ্গে।

এ-লেখার পাঠকরা ঠিক ‘ঘেটো-সংস্কৃতি’ কথাটা বুঝবেন না, একটু বলে নিই, বাঙাল দেশে একটা প্রবাদ আছে:

‘বউ নষ্ট ঘাটে/ছেলে নষ্ট হাটে’

এখন গ্রামে বারোয়ারি দীঘি নেই, দীঘি হয়ত আছে তার মালিকরা সেটাকে ‘ছিপ-নেশাগ্রস্ত’ শহুরে বাবুদের জন্য টিকিট করে মাছ ধরতে দেন। সাপ্তাহিক বিনোদনের, মানে ‘উইকএন্ড’ কাটাবার জন্য বাবুরা যান। এই প্রবাদের জন্মকালে দীঘিগুলো ছিল ব্যক্তিগত মালিকানার সামাজিক সম্পত্তি (চীনের বর্তমান গতি-প্রকৃতি যাঁরা বুঝতে চাইছেন, মানে বুদ্ধবাবুরা ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পারেন, প্রভাত পট্টনায়েক-উৎসারা হয়ত ব্যাখ্যা খুঁজে পাবেন। আমি এক মূর্খ, এইটুকু জানি)। গ্রাম্যজীবনে আজকের গতিও ছিল না। দুপুরবেলা স্বামী-শ্বশুর-পুত্রদের খাইয়ে-দাইয়ে বাড়ির বউরা এঁটো থালা-বাসন নিয়ে দীঘির ঘাটে জমতেন মাথায় একটু তেল-থুপে। আঙুলে করে মিসি, মানে গ্রাম্য ঘরে তৈরি গুল, দাঁতে ঘষতে ঘষতে গপ্পো করতেন: ‘ইস বড়বাড়ির মেজবউ আবার গলা চড়ায়!’... কেউ একজন শুরু করে, ‘তবু যদি মোরা কেউ না জানতাম! ভাতারটা একটা ভেড়ুয়া, দুপুরবেলা ওর ঘরে, সেদিন দেখি গো দিদি, ছোটবাবু ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল! ম্যা গো! ছিঃ, ছিঃ...’ হাঁড়ি, থালা, বাসন ছোবড়া দিয়ে ঘষতে ঘষতে, কিংবা দাঁতে মিসি লাগাতে লাগাতে চলতে থাকে আলোচনা, কার ঘরে কে ঢোকে, কখন ঢোকে, কার কেলটে ধুমসো ভাতারের ফর্সা মেয়ে হওয়ার রহস্য কী... ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সূর্য হেলে পড়ার সময় ‘ইস দেরি হয়ে গেল! মিনসে ঘুম ভেঙে উঠে পড়লে আর খাওয়াই হবে না!’ টুপ-টাপ ডুব দিয়ে, ভাঙে আসর।

এই কাগজগুলোও তাই, বিমান বসুর ক’টা রক্ষিতা, বুদ্ধদেবের মেয়ে কী করে, দু’পা চিরে চারশো বাচ্চাকে মেরে ফেলার গল্প, ছবির কারসাজিতে দেনা-করে তৈরি করা বাড়িকে সি পি এম নেতার প্রাসাদ... এইসব ফেরি করেই চলে ওদের। ওরা জানে দেশটা ভারত, যতই শহুরে হোক মানুষ, মস্তিষ্ক জগতে গ্রাম্য, জ্যোতির্বিজ্ঞানের

অধ্যাপক গ্রহ-শান্তি আংটি পরেন! চলে ভাল, লোকে খায় ভাল।

যাক, মনে মনে মজা পেয়ে বলে উঠলাম: 'কেন তুমি মানিলে না', আজিজুল? কেন তুমি মানিলে না যথাকালে প্রলয়ের মানা/লভিলে না বিনষ্টির শেষ স্বর্গালোক।

জনতার চোখ

দীপ্তিহীন

কৌতুকের দৃষ্টিপাতে পথে পথে করে যে মলিন।

ব্যবসায়ী ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'ছিঃ ছিঃ আজিজুলদা, এটা একটা কবিতা হল? তোমার হলটা কী? তুমিই না বুদ্ধদেবের বাড়ানো হাতে হাত মেলাতে চাওনি? তুমিই না...?

ওকে থামিয়ে বলি, 'হার্মাদ দালাল, তাই তো? তখন হাত মেলাতে চাইনি কেন জান? তোমরা ব্র্যান্ড বুদ্ধ করে বুদ্ধদেব জিন্দাবাদ করেছিলে, তার চারপাশ ঘিরে কেউ জমি, কেউ কারখানার জন্য ছাড়, একজন কাকতাড়ুয়া চিত্রকর তো তখন বুদ্ধদেবের চলার পথে বুক পেতে দিত, কারণ ওর বিরুদ্ধে হত্যা করতে পারে এই আশঙ্কা প্রকাশ করে এক বধূ একটি চিঠি তুলে দিয়েছিলেন বুদ্ধদেবের হাতে। তারপর তিনি খুন হয়ে যান। কারণ কী জান, চিত্রকরদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে জমি দিয়েছিল, সেগুলো উনি টাকা নিয়ে বরাত দিয়েছিলেন বিভিন্ন চিত্রকরকে, লক্ষ লক্ষ টাকা। তাঁরা যখন আবাসনের দাবি করেন, উনি বুদ্ধদেবকে ওই জমি, দায়সহ অধিগ্রহণ করার। সরকার করেনি! না, উনি হার্মাদ দালাল নন, ওঁর বাড়িতে তো গেছেন, পাপোশ থেকে বাথরুমের ফোয়ারা সব বিদেশি, উনি সুশীলবাবু! বুদ্ধদেব ওই দায়টা নিয়ে নিলেই হত! আর একজন চিত্রকর? তাঁর বৃদ্ধি বিকাশ সবই তো বুদ্ধদেবের আমলে! বাদ দাও ওসব কথা। এই দেখ সঙ্গদোষ! আমিও তোমাদের মতো ঘেটো-সংস্কৃতি করছি। শুধু একজনের কথা বলেই শেষ করছি,... হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনার কাগজের মালিক! এখন তো ওনার কাগজ সপ্তাহে একদিন আমাকে খিস্তি করার জন্য বরাদ্দ করেছেন, উনি এখন সাংসদ, মধ্যপ্রাচ্যে হোটেল ব্যবসা, কলকাতাতে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য সুদে ঋণ, হোটেল, জাহাজ, ক্লাব এসব নিয়ে দারুণ সংস্কৃতিমান! ছাত্র-আন্দোলনের অনুজ ছিলেন সম্পাদক। কার্যত যুগান্তর থেকে এসে ওই না খেয়েদেয়ে দোরে দোরে ঘুরে কাগজটা তৈরি করেছে, কাগজটা ওরই রক্ত-ঘাম-অশ্রু! তার অনুরোধে টাকার বিনিময়ে (যেটা আমি কোথাও করি না) লিখতে রাজি হয়েছিলাম, টাকার খুব দরকার ছিল, নানান অজুহাতে আমার প্রায় সাত হাজার টাকা ঝেড়ে দিলেন! ওঁর পরমাত্মীয় ম্যানেজার বললেন, 'হোয়াই ইউ আর থিংকিং ইন টার্মস অফ মানি? টাকা, টাকা, টাকা? ডলারে ভাবুন মিঃ হক! ডলারে!...' অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, মানে?

আভিজাত্যের হাসি হেসে বললেন, 'মানে? থিঙ্ক ইনটার্মস অফ ডলার...।' বুঝলাম, আমি তো সুশীল নই, বুদ্ধর মতো ভদ্রলোকও নই, মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'ধুস শালা শুয়োরের বাচ্চা!...'

বেরিয়ে আসি। সম্পাদক দুঃখ পাবে ভেবে, ওকে বিড়ম্বনার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য একটা চিঠি পাঠাই, 'আমি সরাসরি রাজনীতিতে নামব'... ইত্যাদি, ইত্যাদি। পরে ওকে পৃথকভাবে ব্যাপারটা বলেছি। ওর বিড়ম্বনা দেখে বিড়ম্বিত হয়েছি নিজেই।

'...কী বলব বলুন আজিজুলদা? ওরা ভাবে সকলকেই কেনা যায়!'

'বাদ দাও হে ওসব কথা, এগুলো স্বাভাবিক। বিহাইন্ড এভরি বিগ ফরচুন, দেয়ার ইজ আ ক্রাইম!...' যত বড়লোক, মানে ধনী, ততই তার পেছনে সামাজিক অপরাধ লুকিয়ে থাকে। বুঝেছিলেন টলস্টয়, বুঝেছিলেন চীন বিপ্লবের সেনাপতি চুঁ তে!...'

তবুও ওদের প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু, এই যে তোমরা রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ, কিংবা সতর্ক পাহারাদার... তোমরা?

...এবার কিন্তু আপনি বিলো দ্য বেল্ট হিট করছেন? ব্যক্তিগত আক্রমণে চলে আসছেন!

...ব্যক্তিগত? কোনটা? যতদিন তোমরা ব্যক্তি ছিলে বলিনি, বলিনি তো নিজের ইনফ্যাচুয়েশন বা বিকৃত উত্তেজনা তৃপ্ত করার জন্য সহজাত দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে কত মেয়ের সর্বনাশ করেছ? আজ তুমি সংবিধান দ্বারা সুরক্ষিত, আজ তো আমাদের বাবা-জ্যাঠাদের স্লোগানটা তুলে ধরতেই হবে— 'বাংলার পুরনারী হও সাবধান/ওই দ্যাখো মসনদে নলিনীবিষান', নামগুলো একটু পাল্টে...

...কিন্তু দাদা, কথা হচ্ছিল আপনার কবিতা নিয়ে?

চমকে উঠলাম, 'আমার কবিতা?'

...হ্যাঁ, ওই যে বললেন!

না হেসে পারা যায়! হো হো করে হেসে উঠলাম। এরই জন্য পি এন বি বলেছিলেন, যখন অধ্যাপনা করতাম, সেটা ছিল পণ্ডিতদের মূর্খামি, সাংবাদিকতাতে এসে দেখছি মূর্খদের পাণ্ডিত্য। এরই জন্য তোমাকেই ওই মহিলা বলতে পারেন, গান্ধীজির অনশন ভাঙিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ!

...ব্যঙ্গ করবেন না!

উত্তেজিত হয়ে ওঠে সাংবাদিকশ্রেষ্ঠ, গ্রামেগঞ্জে লোক পাঠিয়ে যিনি সংবাদ তৈরি করতে ওস্তাদ। বাজারে বিশ্বাসী। সি পি আই (এম) অফিস ভাঙলে একশো কুড়ি মাথা প্রতি, বাড়ি ভাঙলে একশো আশি, ওটা কতবড় নেতা তার ওপর নির্ভর করে। দুশো, আড়াইশোও হতে পারে। আগুন ধরানোর রেট সব থেকে বেশি! একেবারে বাজারি হিসেব। টিভির পর্দাতে 'স্টার'রা আনন্দে নেত্য করে।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইঙ্গিতে হাতটা গলার কাছে নিয়ে, আর... 'এই কুচ, কিংবা পটাশ...' খুনের রেট?

সংবাদ তৈরি কারখানার ম্যানেজার হেসে ফেলেন, 'সেটা আমাদের কাজ নয়, রাজনৈতিক বন্দোবস্ত!...'

...আপনার মতো বয়স্ক ব্যক্তিত্ব এরকম ব্যঙ্গাত্মক হাসবেন না!

ম্যানেজার মানে সংবাদ উৎপাদক বেশ রুষ্ট।

...হাসব না, বল কী হে! ওরকম ক'লাইন কবিতা লিখতে পারলে আমি তো উড়তাম, আকাশে উড়তাম। ওগুলো রবীন্দ্রনাথের লাইন শুনেও বুঝলে না!

...ওরা ভুল বা অজ্ঞানতা স্বীকার করতে জানে না। অথচ কমিউনিস্টদের বলে উদ্ধত। ওরা জানে বা দেখেছে শাসক হলেই গুলি, লাঠি চালায়, কোষাগার চুরি করে ফাঁক করে দেয়। আত্মীয়স্বজনদের সাতজন্মের ব্যবস্থা করে দেয়। সুতরাং বিমান, বুদ্ধও তাই। মুশকিলে পড়েছে ওরা, বুদ্ধ গুলি চালাচ্ছে না? বিনাবিচারে কালো আইনে ধরছে না কেন? কংগ্রেসি জমানার মতো প্রতি তিনটে ঘরের পরে একজন জেলে নেই কেন? মানুষের মনে শাসকদের একটা ধারণা আছে, স্থায়ীভাবেই আছে, ওরা গপ্পো বানায়, চিরে ফেলার গল্প, ফেড়ে দেওয়ার গল্প, কাশীপুর-বরানগরের স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে নেয় মানুষ! ওরা সব থেকে বেশি পরমত অসহিষ্ণু, আমার ক্ষেত্রেই ধরুন না, আমার প্রথম গ্রেপ্তারের পর যে অভিযোগে ১৮ মাস জেল খাটতে হল, অভিযোগটা কী? আপনি ভেবেছিলেন সশস্ত্রভাবে যুবকদের সংগঠিত করে আইনে প্রতিষ্ঠিত সরকারকে উচ্ছেদ করবেন! ভাবুন একবার 'ভাবা'টাও নিষিদ্ধ ছিল।...

অ্যাঙ্করবাবুরা যা করে থাকেন, সাংবাদিকপ্রবর তাই করলেন।

...না, আমি বুঝেছিলাম, কিন্তু ভাবলাম, আপনি রবীন্দ্রনাথ আওড়াবেন! আপনারাই তো রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি বলেছিলেন...

বাধা দিয়ে বললাম, তোমাদের সুশীলস্য সুশীল মুখ্যমন্ত্রী কী বলেন জানি না, আমি এখনও মনে করি ব্রিটিশ ভারতে দুজনই স্বাধীন বুর্জোয়া লেখক জন্মেছিলেন, একজন রবীন্দ্রনাথ, অন্যজন রাজশেখর বসু। আর ভাই সাংবাদিক, এটুকু তো জান, পরাধীন একটা দেশে স্বাধীন-বুর্জোয়া চিন্তাটা একটা বিপ্লবী পদক্ষেপ! তোমরা সত্যিই গন্ডারিরায় বাটপেড়িয়া!

...মানে?

...মানে রাজশেখর বসু পড়ে নাও, চামড়াটা গন্ডারের, বাটপাড়ি করে গলা ফাটাও। জয় হোক তোমাদের।

উঠে চলে আসার মুখে ব্যবসায়ী বন্ধুটিকে বললাম, সমাজে, অর্থনৈতিক সঞ্চালনে তবুও তোমাদের দরকার, পণ্য উৎপাদনে না হলেও পণ্যের সঞ্চলনে তোমরাই আছ, তোমরা না থাকলে হাত পাতব কার কাছে?

সে ছেলে তুখোড়, বুঝলে দাদা, এবার একটু ভুল করলে, স্পেকুলেটিভ বা কী হতে পারে ভেবেই আমার তোমাকে দেব। ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট ফর গুড পারপাস, ধরেই নেব ওগুলো ভোগে যাচ্ছে... কিন্তু যখন দেখব 'নো হোপ!' আমরা আমরাতেই চলে আসব।

চলে আসতে আসতে শুনলাম, 'ইস, এই লোকটা সি পি আই (এম)-এর দালাল হয়ে গেল।... তাও আনপেইড দালাল!...'

## দ্বিতীয় অধ্যায়

'জীবনটা আপন সকল সঞ্চয়
ছড়িয়ে রাখে কালের চলাচলের পথে।
তার অবিরাম ধাবিত চাকার তলায়
গুরুতর বেদনার চিহ্নও যায়,
জীর্ণ হয়ে, অস্পষ্ট হয়ে।...'

দালাল! কবে শুনেছিলাম, নতুন করে মনে করার চেষ্টা করলাম। হ্যাঁ, ১৯৫৯ সাল, আশিজন কৃষককে পিটিয়ে মারল বিধান রায় সরকার। উত্তাল বাংলা। এমন সময় খবর আসে, হিন্দি-চীনী ভাই ভাই নাকি ঠাঁই ঠাঁই হয়ে গেছে, চীন নাকি ভারতের একডজন সৈন্যকে মেরে কফিনবন্দী করে দিল্লিতে পাঠিয়ে হুমকি দিয়েছে... খবরের অপেক্ষাতে ছিল খাদ্য-আন্দোলন পরিচালন কমিটির দু-চার দল। 'চীনের দালাল কমিউনিস্টদের সঙ্গে আন্দোলন করা যায় না,...' মাঝপথে স্তব্ধ আন্দোলন। উগ্র দেশপ্রেমের আড়ালে ভারত সরকারের প্রভু বদলের খেলা চলছে... নিস্তরঙ্গ জনজীবনে ছাত্র-যুবকরাই বিদ্রোহের পতাকাটা তুলে ধরল, তারা সদ্য হারিয়েছে তাদের প্রিয় নেতাকে। আসল ঘটনা তুলে ধরে কমিউনিস্ট পার্টি পাড়ায় পাড়ায় সভা করতে থাকে। ভারতীয় সংসদে নেহরু দ্ব্যর্থহীন ভাষাতে বারবার বলেছেন তিব্বত চীনের অংশ, মূল চীনা সরকার তিব্বতে সাধারণ মানুষের সংস্কারকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লামাদের স্বায়ত্তশাসন মেনেই চলছিল। সমগ্র চীন যখন লাফ দিয়ে এগিয়ে চলছিল, খাদ্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে একটার পর একটা বিজয়লাভ করছিল, মরুভূমিতে ফসল ফলাচ্ছিল, তিব্বত ডুবছিল অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকারে। ধর্মের অনুশাসনে দলাই

লামা তিব্বতি জনগণকে আধুনিক চিকিৎসা পর্যন্ত গ্রহণ করতে দেবেন না, ফতোয়াবাজির রাজত্ব। তিব্বতি জনগণের যাতায়াত বৃদ্ধি পেয়েছিল মূল চীনের সঙ্গে। তাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা এবং বিজ্ঞানচর্চা বাড়ছিল। ফতোয়াবাজির স্বায়ত্তশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের রোষ কাজে লাগিয়ে দলাই লামার এক শরিক পঞ্চেই লামা বিদ্রোহ ঘোষণা করে মূল চীনের সাহায্য প্রার্থনা করে। দলাই লামার পতন ঘটে। কয়েক মন সোনা এবং হাজার দুই অনুগামী নিয়ে সে ভারতের দিকে রওনা হয়। নেহরু প্রথমে তাকে প্রবেশের অনুমতি দেননি। কিন্তু অভ্যন্তরীণ সঙ্কটে জর্জরিত নেহরু সরকার, কংগ্রেসের মধ্যকার রাজা-মহারাজা এবং রাষ্ট্রীয় দুর্নীতিতে ১২ বছরেই অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণমুক্ত একটা দেশ দুর্ভিক্ষের কিনারায়। অন্ধের মতো শিল্প গড়ে তুলতে গিয়ে, অভ্যন্তরীণ বাজার তৈরির কাজ উপেক্ষা করে সেরেফ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর ছেড়ে দেওয়া বাজারের ওপর নির্ভর করার ফলে, 'ঋণাং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' নীতি নেহরুকে পুরনো অভিজাত সাম্রাজ্যের বদলে উঠতি সাম্রাজ্যবাদ আমেরিকার দিকে ঠেলে দিল। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে শিল্পপণ্য উৎপাদক গোষ্ঠী এবং কৃষিপণ্য উৎপাদক গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে... সঙ্কট রাজনৈতিক সঙ্কটের রূপ নেয়। এটা মোকাবিলার জন্য নেহরুর প্রয়োজন ছিল একটা বৃহৎশক্তির সাহায্য। ব্রিটিশের মতোই দক্ষিণ এশিয়াতে নিজের সামরিক রাজনৈতিক প্রভুত্ব কায়েমের জন্য আমেরিকারও পৃথিবীর ছাদ বলে কথিত রণনৈতিকভাবে অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চলে প্রভুত্ব কায়েম বিশ্বসম্রাট হওয়ার জন্য অত্যন্ত জরুরি ছিল। এর সেদিনও বুশ আমলে বিনা দ্বিধাতে আমেরিকা ঘোষণা করেছে, 'এমপেরর'স পলিসি অন দি রুফ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড' পৃথিবীর ছাদ সম্পর্কে সম্রাটের নীতি। বিশেষ করে নয়াচীনের প্রতিষ্ঠা, এশিয়ার বুকে সমাজতন্ত্রের প্রসার রোধে, আমেরিকার জন্য তিব্বত একান্ত প্রয়োজন। এশিয়ার বুকে সমাজতন্ত্রের, বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর প্রভাব রুখতে সর্বস্ব নিয়ে ধর্মযুদ্ধের জিদ ধরে নেমে পড়ে আমেরিকা। আমেরিকার চাপেই নেহরু দলাই লামাকে ভারতে আশ্রয় দেন। বলা যেতে পারে আমেরিকার সামনে এই ভারতের হাঁটু গেড়ে বসার শুরু। ভারতের ওপর চাপ ছিল তিব্বত মুক্ত করে দলাই লামাকে বসানো। তিব্বতের বুকে নামতে শুরু করে ভারতীয় ছত্রী সেনা। তিব্বতি জনগণের ফৌজই তাদের মোকাবিলা করে। তখনও চীনের মূল লাল ফৌজ আসেনি তিব্বতে। চোদ্দো (বা ষোলোজন) জন ভারতীয় সেনা নিহত হন। বারবার গন্ডগোল বাধাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে সুসময়ের অপেক্ষাতে দলাই লামা ক্ষান্ত হয়। বহু রক্ত ঝরিয়ে, বহু প্রাণনাশ করে ঝাড় খেয়ে শান্তির উপাসক হয়ে ওঠেন। ধর্মগুরু হয়ে ওঠেন... মনে আছে আমেরিকা-দলাই লামা-ভারত চক্রের বিরুদ্ধে এক সভাতে প্রথম আক্রান্ত হয়েছিলাম। লাঠি,

সোডার বোতল নিয়ে আক্রমণ করেছিল চেনা একদল গুন্ডা-কাম-ছাত্র। ঘুসির সঙ্গে শুনলাম, শালা চীনের দালাল!

মনে মনে গর্ব অনুভবই করেছিলাম। যাক দেশটাকে আমেরিকার পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ার বিরুদ্ধে দালালিই করেছি তা হলে! দেশকে বিক্রি করে দেওয়ার চেয়ে কারও 'দালাল' হয়ে সেটা ঠেকানো ভাল। ১৯৫৯ সালে, ওদের এই 'দালাল' খেউড় তেমন দাগ কাটেনি। কারণ মানুষের মধ্যে তখনও খাদ্য-আন্দোলনের বেনামি জমি উদ্ধারের আন্দোলনের রেশ ছিল। লোকে দেখলেন, এই সমস্ত রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে তাদের পাশে থেকে, পুলিসের লাঠি, গুলি নিজেদের ওপর টেনে নিয়ে (জনতাকে ঢাল করে আড়ালে অক্ষত থেকে নয়) যাঁরা লড়েছেন, তাঁরা দালাল!! এদের 'দালাল' বলে চিহ্নিত করতে গিয়ে পত্রিকাগুলো উপহাস্য হয়ে উঠল। লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিক মানে বুদ্ধিজীবীরা (আজকের সুশীলবাবুদের কারও বাবা, কেউ-বা নিজে) লজ্জায় মুখ ঢেকে প্রতীকী যুদ্ধ শুরু করল... আবার সুদিনের অপেক্ষাতে তাঁরা বসে থাকলেন, কেউ প্রকৃতিপ্রেমী হয়ে, কেউ রাজনীতি কত খারাপ, দেখিয়ে নারী-দেহের ভূগোলে নিজেকে ব্যস্ত রাখলেন! নাট্যকাররা বর্তমান থেকে আর নাটকীয় কিছু না পেয়ে ফিরে গেলেন কালিদাসের কালে, কিংবা বিদেশি নাটকে!

অবিভক্ত পার্টিটাই ছিল সেদিন 'দালাল'। সুতরাং ব্যক্তি আমি, দালালদের একজন হিসেবে, চীনের স্বপক্ষে প্রকাশ্যে গলা ফাটাতে কোনও বাধা পেলাম না। মুগ্ধ হয়ে চীনের এগিয়ে যাওয়া লক্ষ্য করতাম। চীন থেকে আসা কাগজ, বইপত্র প্রচার করতাম। দলাই লামার কুকীর্তিগুলো পোস্টারে, প্রচারে তুলে ধরতাম। তিব্বতে হতে চলেছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, মেডিক্যাল কলেজ সবই ছিল প্রেরণার উৎস। হিম্মতের উৎস হয়ে উঠল চীন।

ঋণ করে ঘি খেতে গিয়ে নেহরু ডুবছেন, মানুষজন ফুঁসছেন। নয়াচীনের অভূতপূর্ব অগ্রগতি সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর সামনে পরিষ্কার পথ দেখাচ্ছে অগ্রগতির পথ কোনদিকে। আরব দেশগুলোতে ধর্মীয় সংস্কার আর পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলোকে চ্যালেঞ্জ জানালেন সেখানকার মানুষজন। কোরিয়াতে নির্বাচনের নামে সিন-ম্যান-রি সরাসরি মার্কিন মদতে যে জালিয়াতি করল, সেটা ধরা পড়ে গেল কিম ইল সুঙ-এর পার্টির তৎপরতায়। তাঁরা সরাসরি বিদ্রোহ করলেন। গণতন্ত্রের ভাঁওতাবাজির মোহমুক্ত কোরীয় জনগণের বিরুদ্ধে দক্ষিণ অঞ্চল দখল করে আমেরিকা পরিষ্কার গৃহযুদ্ধ ঘোষণা করল... বিশ্বজনগণ অবাক হয়ে দেখল, নির্বাচন মানে প্রহসন, বন্দুক-ই শেষ কথা বলে। ভোটে জালিয়াতির নাম হয়ে গেল 'সিন-ম্যান-রি' ব্যাপার। কেউ বলত না রিগিং। শান্তির নামে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী পাঠাল, ভারতের বাহিনী তাতে

অংশগ্রহণ করে। তাদের কাজ হল নিরপেক্ষতার নাম করে কমিউনিস্ট বাহিনীকে ধ্বংস করা। ভারতের বুকে প্রতিবাদ জাগল, দাবি উঠল ভারতীয় বাহিনী ফেরত আনো... কিম-ইল-সুঙ সদ্যমুক্ত চীনা লাল ফৌজের সাহায্য চাইলেন, লিন-পিয়াও-এর নেতৃত্বে চীনা লাল ফৌজের সাহায্যে কিম-ইল-সুঙ-এর বাহিনী হয়ে উঠল অপ্রতিরোধ্য। উত্তর কোরিয়া থেকে আমেরিকাকে বিদায় নিতে হল। কোরিয়া ভাগ করে দক্ষিণাঞ্চলটাকে নিজের উপনিবেশ করে তুলল আমেরিকা। ইন্দোচীনে মুক্তিযুদ্ধ শক্তিবৃদ্ধি করে হো-চি-মিনের নেতৃত্বে জেনারেল গিয়াপ ল্যাজেগোবরে করছেন আমেরিকার নেতৃত্বাধীন পশ্চিমি শক্তিকে। পাকিস্তানকে ঘাঁটি করে ভারতকে চাপে রেখে চীনকে ঘেরার রণনীতি কার্যকর করার জন্য সি আই এ তৎপর হল। একদল আমেরিকানপ্রেমী বুদ্ধিজীবীর সৃষ্টি হল। প্রত্যেকটা খবরের কাগজে, সিনেমা শিল্পে তাদের লোক সক্রিয় হয়ে ওঠে। যা-কিছু ভারতীয় সবই খারাপ, ছাত্র-যুবদের আমেরিকাপ্রেমী করে গড়ে তোলার প্রতিষ্ঠান, লেখক-শিল্পীদের কেনার সংগঠন ফোর্ড ফাউন্ডেশন, বিশ্ববিদ্যালয়, পুরস্কার চালু করে। মতাদর্শগতভাবে, 'সাম্রাজ্যবাদ'কে মানে পরাধীনতাকে পরোক্ষে মেনে নেওয়ার প্রচার শুরু হয়। বাংলার মানুষজন এগুলোর সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হয়েই যে-যার ফ্রন্টে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন কোন বাজারি নাম, তৈরি করা প্রতিথযশা নাট্যকার, কিংবা সাহিত্যিক, রেহাই পায়নি। চিহ্নিত হয় সি আই এ-র সঙ্গে সরাসরি যুক্তরা। ফোর্ট ফাউন্ডেশনের টাকা নিয়ে আজকের ম্যাগসেসে প্রাপ্তার যে অভিমান, যে-ক্ষোভ কাগজে বেরিয়ে আসে। চোরের মালের বখরা নিয়ে গন্ডগোলে চোরগুলো, দেশকে আমেরিকার হাতে তুলে দেওয়ার উকিলগুলো চিহ্নিত হতে থাকেন, না-পেয়ে একদল জামা পাল্টায়। ওদিকে নেহরুর ওপর চাপ। চীনের অগ্রগতি ঠেকাতে গেলে চীনকে সীমান্তে ব্যতিব্যস্ত রাখতে হবে...

বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদী এই অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক-সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতি সবচেয়ে বড় আঘাত হানে সোবিয়েত রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি। স্তালিনকে নস্যাৎ করে ক্রুশ্চভ একদিকে বিশ্বজনগণকে হতাশ, বিভক্ত করে, অন্যদিকে আমেরিকা-সহ সমস্ত পুঁজিবাদী নেতৃত্বকে ইঙ্গিত পাঠায় বিশ্বকে ভাগাভাগি করে নেওয়ার রণনীতিতে সে অংশীদার হতে চায়। সোবিয়েত রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি সরাসরি সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙার কাজে হাত লাগায়। মাও-সে-তুঙের নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যেহেতু স্তালিনের মহান অবদান এবং অ-বিসংবাসী নেতৃত্বকে তুলে ধরে মতাদর্শগত, রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন, সোবিয়েত নেতৃত্বের রাজনৈতিক দেউলেপনা তুলে ধরছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদী নেতাদের সঙ্গে ক্রুশ্চভের সমাজতন্ত্র ধ্বংসের ষড়যন্ত্রকে ধরে ফেলেছিলেন। ক্রুশ্চভ কোনও সতর্কীকরণ ছাড়াই চীনের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে রাশিয়ার সমস্ত সাহায্য তুলে নেয়। চীনের সমস্ত প্রকল্প থমকে যায়, কারণ শতকরা নব্বুই ভাগই ওয়ারশ' চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়ার প্রযুক্তি এবং অর্থনির্ভর।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে চীন এবং চীনা-পার্টি ছিল হিম্মতের উৎস। রাশিয়ার এই চরম বিশ্বাসঘাতকতা ভারতের ছাত্র-যুবক-কৃষক-শ্রমিকদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। সবচেয়ে মারাত্মক হল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পুরনো নেতারা 'মাদার পার্টি' সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে উগ্র চীন-বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। রাশিয়ার পরিষ্কার ইঙ্গিত, 'তোমরা (সাম্রাজ্যবাদীরা) যদি চীন আক্রমণ কর আমরা নিরপেক্ষ থাকব, প্রয়োজনে মদতও করব! আমেরিকা নেহরুর ওপর চাপ সৃষ্টি করে চীনকে শিক্ষা দাও, তিব্বতকে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে দখল করে দলাই লামাকে প্রতিষ্ঠা কর।' অভ্যন্তরীণ সঙ্কটে জর্জরিত নেহরু, অর্থনৈতিক সঙ্কট রাজনৈতিক সঙ্কটে পরিণত হয়ে দেশের গতি স্তব্ধ করে দিয়েছে। জনগণ ফুঁসছেন, ফ্যাসিবাদী একনায়কত্ব ছাড়া শাসন সম্ভব নয়। ফ্যাসিবাদ কায়েমের সবচেয়ে ভাল মাস-লাইন উগ্র-দেশপ্রেম, উগ্র-জাতীয়তাবাদ। যৌবনের ফেবিয়ান-সমাজতন্ত্রী নেহরুর চেয়ে এটা আর কে ভালভাবে জানে? বিদেশযাত্রার আগে নেহরু ১৯৬২ সালে জেনারেল কাউল-কে চীন আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে যান। আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে কয়েকশো মাইল দূরে ঠেলে দেওয়ার নির্দেশ দেন 'পুশ দেম ব্যাক'। ভারতীয় বাহিনী হঠাৎ অক্টোবর মাসে চীন আক্রমণ করে।

হতভম্ব বিশ্বজনতা। স্মরণাতীতকাল থেকে, সংস্কৃতিগতভাবে, আত্মিক সম্পর্কে সম্পর্কিত দুটো অতিপ্রাচীন সভ্যতা এবং দর্শনের দেশ যুদ্ধে লিপ্ত।

আমেরিকা এবং জাপান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে টক্কর নেওয়া বাহিনী। ভিক্ষা করে নতজানু হয়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের স্বার্থ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাওয়া স্বাধীনতা নয়। প্রতিটি ইঞ্চি জমির জন্য লড়াই করে অসংখ্য প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা এবং মুক্তিপ্রাপ্ত একটা দেশের ফৌজ, জনগণের ফৌজ— চীনা লাল ফৌজ, ভাড়াটে সৈন্য নয়, তাঁরা প্রত্যাঘাত করলেন। ভারতীয় বাহিনী একটার পর একটা লজ্জাজনক পরাজয় বরণ করতে থাকে... 'দরবারে হেরে মাগ (বউ)-কে ধরে মারে' সীমান্তের লজ্জাজনক পরাজয় ঢেকে দেওয়ার জন্য আক্রমণ নেমে আসে কমিউনিস্ট পার্টির একাংশ এবং গণআন্দোলনের ওপর। শিল্পী-সাহিত্যিক-নাট্যকাররা কমিউনিস্ট নিধনের জন্য দেশপ্রেমের বন্যা বইয়ে দেন। আনন্দবাজার-সহ সমস্ত কাগজ, রেডিওতে হিংস্র প্ররোচনা। জওয়ানদের মনোবল বাড়ানোর জন্য আনন্দবাজারের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে

'মুক্ত সাহিত্য সমাজ'। কে ছিলেন না সেই দলে? আজকের সুশীলবাবুদের মধ্যে যাঁরা বয়স্ক, সকলেই সই করে চীন প্রতিহত করার জন্য কমিউনিস্ট নিধনের ফতোয়া দেন। যাঁরা অল্পবয়সী বা মাঝবয়সী, তাঁদের পিতৃদেবরা ছিলেন, নেতৃত্বে ছিলেন চিত্র-পরিচালিকার পিতৃদেব। উৎপল দত্ত চুরি-করা নাট্যকারের পিতৃদেবরা! শুরু হল বই পোড়ানোর উৎসব। ক'দিন আগেই মনোজ বসু চীন ঘুরে এসে উচ্ছ্বসিত হয়ে দু'খণ্ড বই লিখেছিলেন 'চীন দেখে এলাম'। নিজে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্য রাস্তাতে সেই বইয়ের বহ্ন্যুৎসব করেন। বলেন, সব ভুল দেখেছিলাম (পরে বামফ্রন্ট ক্ষমতাতে আসার পর আবার প্রকাশ করেন! ইহারাই সুশীল, স্বজন!)। বিনা বিচারে গ্রেপ্তার হতে শুরু করেন গণআন্দোলনের নেতারা, পার্টি দ্বিধাবিভক্ত। বইয়ের দোকান থেকে কলেজ-ইউনিয়ন সর্বত্রই কংগ্রেসি গুন্ডাদের আক্রমণ, পার্টি অফিস ভাঙচুর, দখল, লালঝান্ডার বহ্ন্যুৎসব... চীন কথাটা উচ্চারণ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এসবের পক্ষে যুক্তি হাজির করতে থাকেন 'মুক্ত সাহিত্য-শিল্পী' সমাজ। মানে শম্ভু মিত্র থেকে চপলা ভট্টাচার্য, চিদানন্দবাবুরা! নাটকে, সাহিত্যে, কবিতায় কমিউনিস্ট নিধনের গান...। মেয়েরা লাল জামা পরে বাইরে বেরোতে পারেন না। ব্লেড মারে ছোটদা-বড়দারা... গাল-কাটা, হাত-কাটাদের দাপাদাপি।

শিয়ালদা স্টেশনে দেখেছিলাম, চীনাবাদাম ফেরি করছিল যে ছেলেটা মমফলি বা বাদাম না বলে চীনাবাদাম বলার অপরাধে, আজকের সাংসদ, সেদিনকার সদ্যযুবক এবং তার দলবল কী মার-ই না মেরেছিল। রক্তাক্ত সেই ফেরিওয়ালার অচৈতন্য দেহ বুকে করে এন আর এস-এ নিয়ে গিয়েছিলাম। কী করে ভুলব অশোক সেই দৃশ্য? তার রক্তে ভেজা জামাটা জীর্ণ হয়ে গেছে, ছেঁড়া জামাতে রক্তের দাগ কতদিন থাকে! হ্যাঁ, আমি 'দালাল' হয়ে গেলাম। ওদিকে রেডিওতে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু সেনগুপ্ত থ্যাটারি করে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে খুনিদের উৎসাহ দিচ্ছেন। হঠাৎ বামপন্থী মঞ্চে ওঁদের দেখে চমকে ওঠা অন্যায়? ওঁরা পদ্মশ্রী পেলেন, তা পান। দাঙ্গাবাজদের গণ-হিস্টিরিয়া তৈরি চলল... পার্টি দ্বিধাবিভক্ত, জনগণ বিভ্রান্ত, ভীত, সন্ত্রস্ত। যাঁরা একসময় মিছিলে হাঁটতেন, গলা ফাটাতেন, মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকছেন... আমরা দালাল হয়ে গেলাম!

কেমন দালাল? ভিয়েতনামে আমেরিকান সৈন্যদের বিষাদ কাটানোর জন্য মনোরঞ্জন দরকার। ভারতীয় আজকের ভাষাতে যাকে বলে 'আইটেম গার্ল', তাদের পাঠানোর দাবি জানাল আমেরিকা, না হলে গম আসবে না। আমাদের মেয়েদের পাঠানো হবে ভিয়েতনামে?

আমেরিকান সৈন্যদের জন্য? দেশপ্রেমিকরা চুপ, বোধহয় ভাবছিলেন তাঁরা, তাঁদের বউ, মেয়েতে টান পড়বে না তো? বিরোধিতা তো করেনই নি, বরং ছবি ছাপল সেই সমস্ত মেয়ের। রাতের অন্ধকারে কারা যেন পোস্টারে কলকাতা ছেয়ে ফেলল, 'রীতা ফারিয়া(রা) গাইলো, টন টন মাইলো আইলো!' ছিঃ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্টার পড়ল: যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই/চৌ-নেহরু বৈঠক চাই! সেই পোস্টার ছাপিয়ে কাগজে সম্পাদকীয় লেখা হল, এবং দেশদ্রোহী, সেনাদের মনোবল ভাঙার চক্রান্ত! তালা ঝুলল ইউনিয়ন অফিসে।

ইতিমধ্যেই বুঝে নিয়েছিলাম পার্টি, দুই গোষ্ঠীই খুঁটোতে বাঁধা গরু, যতদূর দড়িটা যাবে ততটাই যাবে... মানুষকে হিম্মত জোগাতে গেলে ওই খুঁটোটা উপড়াতে হবে... দেশপ্রেমিকরা দেশের মেয়ে, মাটি খাটিয়ে রোজগারে মত্ত... দালালরা কী আর করে? চক্রান্ত, পাল্টা 'চক্রান্ত'। ইজ্জত বাঁচানোর চক্রান্ত। হ্যাঁ, স্বীকার করতে দোষ কী? 'চক্রান্ত' করেছিলাম আত্মস্বার্থবাদী, আত্মরতিসর্বস্ব একদল বুদ্ধিজীবীর বিরুদ্ধে, মিরজাফর-মার্কা শাসক এবং তাদের মদতপুষ্ট 'ব্ল্যাক-শার্ট'দের বিরুদ্ধে চক্রান্ত! ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রত্যাঘাত শুরু হল। পুড়তে শুরু করল কংগ্রেসি টুপি, পতাকা। বেছে বেছে গুন্ডাদের সর্দারদের পেটাই... আঁধার দেখে, আড়াল খুঁজে, ঝোপ বুঝে কোপ মার...

ওদিকে বাড়িতে ডাকাত পড়লে গেরস্থ যেমন বড়রাস্তা পার করে তাকে ধাওয়া করে, চীনা লাল ফৌজ আক্রমণকারী ভারতীয় ফৌজকে বমডিলা পার করে, মানে পূর্বাঞ্চলে ভারতের শেষ ঘাঁটিটা ধ্বংস করে একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে ফেরত চলে যায় আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখার ওপারে। বিশ্বের যুক্তিবান, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ দু'হাত তুলে চীনকে অভিনন্দন জানায়। নেহরুর দুই পুরুষের বন্ধু ব্রার্ট্রান্ড রাসেল পরিষ্কারভাবে বললেন, 'চীনের যদি ভারতের এক ইঞ্চি জমির প্রতি লোভ থাকত, তা হলে বমডিলা পতনের পর তাদের সামনে কলকাতা যখন খোলা, তারা ফেরত যেত না! কে কবে দেখেছে বিজয়ী বাহিনী এরকমভাবে পশ্চাদপসরণ করে? কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে নয়, বাংলা তথা ভারতের বিবেকবান সত্যিকারের দেশপ্রেমিকরা যুক্তি পেলেন রাসেলের কাছ থেকে। জর্জ থমসনের কাছ থেকে,। প্রতিথযশা নামী-দামি আত্মবিক্রীত বুদ্ধিজীবীদের মোকাবিলা করার জন্য বেরিয়ে এলেন নতুন নতুন মানুষ। রাসেল তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'আন আর্থড ভিক্টরি' লিখলেন। বন্ধু রাসেলের এই পুস্তিকাটি নেহরু নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে এক মুহূর্তও দ্বিধা করেননি, বেচারা নেহরু! এফ বি আই (আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা) দাবি করল, ভারতীয়রা ঠিক কমিউনিস্ট বিরোধী প্রচার করতে পারছে না, এ আই আর-এ (রেডিও) সরাসরি নিয়ন্ত্রণ, কলকাতা, মুম্বই, দিল্লিতে ভয়েস অফ আমেরিকার দপ্তর বসবে। তাদের জন্য

একটা প্রাইম-টাইম দিতে হবে। বুদ্ধিজীবীরা ডলারের ঝঙ্কারে হইহই করে সমর্থন করলেন! ভাবতে পারেন এঁরা কারা? কোন দেবতাকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুজো দিয়ে এসেছে। বুদ্ধবাবুর দপ্তরের কল্যাণেই সেদিনকার সেই লোকগুলো জামা পাল্টে হঠাৎ 'বাম' হয়ে গেল? অবাক হয়ে দেখলাম! কলকাতার ছাত্র-যুবকরা এই প্রথম পথে নামলেন, সমস্ত হতাশা কাটিয়ে, দৃপ্ত পদক্ষেপে কলেজ স্ট্রিটের রাস্তা আবার কেঁপে উঠল! বউবাজার ধরে, 'ভি ও এ চুক্তি বাতিল করো' স্লোগান তুলে মিছিল যখন চলতে শুরু করে, রাস্তার দু'পাশে লোকের ভিড়, ছাদে, জানালাতে উৎসুক মানুষের মুখ। চারপাশে ফিসফিসানি কমিউনিস্ট পার্টি রাস্তায় নেমেছে! হিন্দ সিনেমার কাছে বিশাল পুলিসবাহিনী, কাঁদানে গ্যাস, রাইফেল, স্বয়ংক্রিয় স্টেনগান হাতে দাঁড়িয়ে। সশস্ত্র পুলিসকে সামনে রেখে বিধানবাবুর গুন্ডারা লাঠি, বড় তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল মিছিলের ওপর। (আজ সুশীল- সুশীলারা যে অভিযোগ করছেন, পুলিসের ড্রেস পরে হার্মাদরা আক্রমণ করছে, আসলে ওঁদের মধ্যে যে সেদিনের লোকজন আছেন, তাঁরা জানেন তাঁরা কী করেছিলেন। আমরা করেছিলাম, সুতরাং ওঁরাও করছেন... মার্কস ঠিক এটাই বলেছিলেন, ওরা যা দুষ্কর্ম করে, সেগুলো কমিউনিস্টদের ওপর চাপায়। ওরা মেয়েদের পণ্য করে বাজারের বস্তু করে চলেছে, অথচ বলছে কমিউনিস্টরা মেয়েদের সমাজের ভোক্তা করতে চায়!) মিছিল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু পথচারীদের মুখে মুখে মিছিলের দাবি পৌঁছে গিয়েছিল গ্রামগঞ্জে। সেদিন দেখেছিলাম মানুষের দরদ! আমি দালাল? রক্তাক্ত আমাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন সমাজে ঘৃণ্য, দেহব্যবসায়ী এক মহিলা! পৌঁছে দিয়েছিলেন কলকাতা জেলা অফিসে, পরেরদিন সব কাগজে হেডিং, যতবড় পয়েন্ট করা যায় ততটাই বড় পয়েন্টে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আক্রমণে 'দেশদ্রোহীদের মিছিল ভন্ডুল!' (যেমন আজও হচ্ছে)

জনতা কিন্তু ভেবে রেখেছিলেন অন্য কথা। যুদ্ধের ভার বইতে বইতে ক্লান্ত মানুষ পরস্পরকে প্রশ্ন করেন, কেন যুদ্ধ? কার যুদ্ধ?

রাস্তায় নামে নতুন নাটক, রচনা হয় নতুন কবিতা, গান। নাম-না-শোনা শিল্পী, সাহিত্যিকরা জন্মলাভ করেন। এই পুরনোগুলো, জগদ্দল পাথরের মতো মানুষের প্রতিভার উৎসমুখে চেপে বসেছিল। ওরা সরে যেতেই আমরা দেখতে পেলাম উৎপল দত্ত, জোছন দস্তিদার, বেণু দাশগুপ্ত, সোরি ঘটকদের, এগিয়ে এসে ওদের অভিনন্দন জানালেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস, ঋত্বিক ঘটকরা...

সেদিন যদি কিছু চীনের দালাল খুঁটো ছিঁড়ে সীমানা অতিক্রম না করতেন, ভারতের বুকে নেমে আসত অন্ধকারের রাজত্ব। ভারত হত দক্ষিণ কোরিয়ার মতো একটা উপনিবেশ মাত্র। ওদের চরিত্র উদ্ঘাটনে নেতৃত্ব দিলেন সরোজ দত্ত, শিল্পীর শিল্পী।

দালাল শিরোমণি। বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করলেন, তারপরে 'হ্যাঁ, আমরা তো বলছি চীনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান, তোদের হিম্মত থাকে বল আমেরিকা আমাদের বাবা।' পরবর্তীকালে সরোজ দত্তের এই সদম্ভ ঘোষণার ভিত তৈরি করেছিলাম আমরাই। আজ মনে হতে পারে ছেলেমানুষী, কিন্তু ওই চরম সন্ত্রাসের যুগে হাস্যকর হলেও হিম্মত জুগিয়েছিল, মিত্র স্কুলের গায়ে লাগানো বক্তব্য-পোস্টার। তলায় জ্বলজ্বল করে লেখা 'Indian unit of CPC' বা 'চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ভারতীয় শাখা'! দালাল নই? কিন্তু দেখেছি মানুষের ভিড়। একজন আর একজনকে সরিয়ে পড়ছেন সেই পোস্টার।

বাবা বলতেন দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ শব্দ দুটো, (এক) মা গৃধঃ (লোভ কোরো না), অন্যটা 'মাভৈঃ' হিম্মত রাখ। পরে মাও-সে-তুং পড়তে গিয়ে দেখেছি তিনিও ওই দুটো শব্দের ওপর অসম্ভব জোর দিয়েছেন। বারবার বলেছেন। বিভিন্ন সময়ে, ভিন্ন পরিস্থিতিতেও বলেছেন: 'আত্মস্বার্থ চূর্ণ করো'— এটাই ছিল তাঁর মন্ত্র। 'নির্লোভ ও দৃঢ় হও।' হিম্মতকে সবার ওপরে স্থান দাও। সেদিনকার কতগুলো 'বাচ্চা দালাল', মুক্তচিন্তার বাবুবিবিদের ঘরে ঢুকিয়েছিল। মানি শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা হয়ত তাতে ছিল কিন্তু বার্ধক্যের ঘ্যানঘ্যানানি কিংবা সংগ্রামভীরু প্যানপ্যানির থেকে সেটা কি ভাল ছিল না?

## তৃতীয় অধ্যায়

'আমাদের প্রিয়তমের মৃত্যু
একটিমাত্র দাবি করে আমাদের কাছে
সে বলে— মনে রেখো
কিন্তু সংখ্যা নেই প্রাণের দাবির
তাঁর আহ্বান আসে চারিদিক থেকেই
মনের কাছে...

বয়স তো তিন কুড়ি পার হল। দালাল শব্দটা কেমন বিশেষণের মতো নামের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। ৬২-৬৪-এর ঘটনার পর কত জল বয়ে গেছে তিস্তা-তোর্সা দিয়ে। অবিভক্ত পার্টি দু-টুকরো, তিন-টুকরো হয়েছে। 'দালাল' শব্দটাও তাড়া করে বেড়িয়েছে। সবচেয়ে কষ্ট পেয়েছিলাম যখন একটা কাগজ হঠাৎ পাকিস্তানের দালাল বলে গালাগালি করেছিল। মজাও পেয়েছিলাম, কারণ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বৃহৎশক্তির দম্ভ নিয়ে ভারত বারবার হস্তক্ষেপ করেছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা

যুদ্ধের সমর্থক হয়েও, দু'হাত তুলে বাঙালি জাতির মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেও, ভারতের হস্তক্ষেপ সমর্থন করতে পারিনি। একটি বিদেশি বাহিনীর মতোই ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশের সোনা-দানা থেকে ঝাড়ুকাঠিটা পর্যন্ত লুট করে এনেছে। বাংলাদেশকে কার্যত নিঃস্ব করে, পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশ করে এসেছে। পশ্চিম পাকিস্তানিদের চেয়ে এই আর্থিক লুণ্ঠন কম নয়। ভৌগোলিক অবস্থানের সুযোগ নিয়ে নদীর জল আটকে পদ্মার দু'ধারের জনপদকে ধু-ধু মরুভূমি করেছে। সেই জলবণ্টন সমস্যা আজও আছে। চীনা প্রযুক্তিবিদরা যখন পাল্টা বাঁধ দিয়ে 'ব্যাক-থ্রাস' সৃষ্টি করে আন্তর্জাতিক আইন মেনে ফারাক্কার ওপর জলচাপ সৃষ্টির পরামর্শ দেন, বাংলাদেশের মুক্তিদাত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সেই বিখ্যাত হুমকি 'বোমা মেরে গুঁড়িয়ে দেব'। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছে। কার্যত বাংলাদেশ থেকে গেছে ভারতের দয়াতে। ওখানকার সাধারণ মানুষকে মুক্তির স্বাদটাই পেতে দেওয়া হয়নি।... সুতরাং ভারত-বিরোধী, তার মানে পাকিস্তানপন্থী, অতএব দালাল। মজা নয়। শ্রদ্ধেয় হীরেন মুখোপাধ্যায়, মানে আমাদের প্রয়াত স্যার বলতেন, তোমার নামটা যে আজিজুল হক, তুমি এসব বোলো না।

একবার কিছুদিনের জন্য রটেছিল আমরা সি আই এ-র লোক। ধোপে টেকেনি। পরে অবাক হয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম এটা সি আই এ-রই রটনা। অর্থাৎ কমিউনিস্টদের স্বভাবই হল মনের মানুষ না হলেই সি আই এ-র লোক বলে তাকে বিচ্ছিন্ন করা, 'ষড়যন্ত্র', 'চক্রান্ত' এগুলো সব টিপিক্যাল কমিউনিস্ট কথা, বস্তাপচা।... এটা প্রতিষ্ঠা করার জন্য এরকম উল্টোপাল্টা প্রচার করিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিকে উপহাস্য করে তোলা। বারবার উপহাসের বস্তু হতে কে চায়? সতর্কতা হারিয়ে ফেলে কমিউনিস্ট নেতাদের একাংশ। উদারনৈতিক বুর্জোয়াতে পরিণত হয়। ওরা ওদের ষড়যন্ত্র, অনুপ্রবেশ, অন্তর্ঘাত চালিয়ে যায়। মানুষকে তখন বিশ্বাস করানো কঠিন হয়ে পড়ে। পালে বাঘটা সত্যি সত্যিই যেদিন পড়ে কেউ এগিয়ে আসে না। জলজ্যান্ত চক্রান্ত ধরে বলতে গিয়ে শুনেছি, 'টিপিক্যাল কমিউনিস্টদের মতো বলবেন না তো? আপনাকেও তো সি আই এ-র লোক বলেছিল!' ঘরে ঢুকে ধস নামিয়ে চলে গেলে তাঁরা ভাবেন। এবার শুনতে হচ্ছে সি পি আই (এম)-এর দালাল। মজা পাচ্ছি। বলছে কারা? যারা স্বামী-স্ত্রী-পুত্র-কন্যার অর্থনৈতিক, সামাজিক সমস্তরকম নিরাপত্তা এবং স্বাচ্ছন্দ্যটুকু সি পি আই (এম)-এর শাসনকালে বাগিয়ে নিয়ে বেশ রসেবসে নিরাপদ ছত্রছায়ায় আছেন। অবসর সময়ে বিপ্লবী সাজতে আপত্তি কোথায়? মাও-সে-তুং লিখেছিলেন উদারতাবাদ খণ্ডন করুন। শাসক সি পি আই (এম)-এর নেতাদের

মাও চিহ্নিত ১৪টা উদারতাবাদ বিদ্যমান। হঠাৎ উচ্চকোটির লোকদের কাছে টানতে গিয়ে দূরে সরিয়ে দিলেন আত্মার সঙ্গে সম্পর্কজাতদের। মিত্র খুঁজতে গিয়ে ভিত থেকে সরে গেলেন। সোবিয়েত পার্টির ঊনবিংশ কংগ্রেসে স্তালিনের লিখিত রিপোর্টটা ভুলে গেলেন, 'কমরেডস, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে আমাদের মহান বিজয়ের পর শত্রুরাও আমাদের শ্রদ্ধা ও সমীহ করছে, কমরেডরা সাবধান!' পরপর জেতা, গ্রামাঞ্চলে জোতদার-মহাজনদের সামাজিক-রাজনৈতিক খর্ব করে পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠা। একদা শত্রু, প্যাথলজিক্যাল লাল-বিরোধীদের সমীহ আদায় করে নেয় ওরা। তারাও জামা-পাল্টে কাছাকাছি চলে আসে। আসে তাদের পুরনো কায়দা আর দুর্নীতিগ্রস্ত করে দেওয়ার কৌশল নিয়েই। বৃদ্ধি ঘটতে থাকে পার্টির। বায়োপসি করলে ধরা পড়ত এটা কারসিনমিক বা ক্যান্সারাস বৃদ্ধি। উন্নয়ন, রিলিফ দেওয়ার কাজই প্রধান হয়ে গেল। সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্বে যে আঘাত হানা হয়েছে, সেটাকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে না নিয়ে গিয়ে কৃষকসভাকে কার্যত অকেজো করা হল। পঞ্চায়েতের কাজ চালাতে ডাকা হল বিদেশি সাহায্যপুষ্ট বকলমে সাম্রাজ্যবাদী অনুচর স্বেচ্ছাসেবীদের দলগুলোকে। তারা গ্রামগুলোকে দূষিত করার সুযোগ পেল...

সমাজিক-সাংস্কৃতিক কর্তৃত্ব হারানো পুরনো সামন্তপ্রভু, জোতদার, ধর্মগুরুরা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দখল করে নিজেদের স্বর্গীয় দিন ফেরত আনার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। পেয়ে যায় লুম্পেন-পুঁজি প্রতিষ্ঠিত একটা দল...

অশক্ত আমি, ভগ্নস্বাস্থ্য। কী আর করতে পারি! চোখের ওপর দেখতে লাগলাম গর্তে ঢুকে থাকা বিষধরগুলো 'বসন্ত' হাওয়ার গন্ধ পেয়েছে... গ্রামবাংলাতে, বিশেষ করে হাওড়া, মেদিনীপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে তাদের আশা-কে প্রয়াসে পরিণত করার চষ্টা। পথ সেই একটাই। দুর্গের ভেতর থেকে দুর্গ দখল। চিৎকার করতে শুরু করলাম। প্রতিক্রিয়ার পুনরুভ্যুত্থানের যুগ শুরু হল। বিপ্লবী বন্ধুরা বললেন, সি পি আই (এম)-কে বাঁচানোর চেষ্টা। বললাম, বন্ধুরা, শ্রেণীটা দেখ, ওদিকে তথ্য-সংস্কৃতি বিভাগ কত উদার, প্রমাণের জন্য 'শতপুষ্প প্রস্ফুটিত হোক' স্লোগানের আড়ালে শত শত পার্থেনিয়ামকে বিকশিত করতে শুরু করল... উচ্চকোটির আশীর্বাদধন্য হল। লেনিন চিত্রিত হচ্ছেন নারীলোলুপ সাইকোটিক হিসেবে। হিটলার কত মানবিক!

নান্দনিক চর্চাতে বিষয় নয়, আঙ্গিক, বক্তব্য নয়া নান্দনিক দিককে গুরুত্ব দিতে গিয়ে কার্যত সাংস্কৃতিক-লাইনটাই ধ্বংস হল। শিল্প- সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তুলে ধরা হতে থাকল প্যাথলজিক্যাল অ্যান্টি পিপল, কমিউনিস্ট বিরোধীদের। এতদিনকার গড়ে-ওঠা গণ-সংস্কৃতিকে কার্যত হাস্যকর করে তুলে ধরা হল। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বীজ বপন করা হল... নিয়ন্ত্রণহীন নন্দনচর্চা। আঁতকে উঠতাম, চিৎকার করতাম,

পশ্চিমবাংলার নাকি একটা প্ল্যানিং বোর্ড আছে। অজিত বসুর মতো মানুষ সেখানে ছিলেন। তার পরে সেটি হয়ে উঠেছিল বিশেষজ্ঞদের বুদ্ধিচর্চার ক্ষেত্র। বহুজাতিক কোম্পানির কালচারে ভাবতে অভ্যস্ত। রাজনৈতিক মতাদর্শ, শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি, শ্রেণীনির্ভরতা গড়ে তোলার বদলে আমলা, বিশেষজ্ঞ-নির্ভরতা বেড়ে উঠল।... পরামর্শদাতারা দেশ, মানুষ, মানুষের মানসিকতা, ইচ্ছা কিছুই বোঝেন না। নিজেদের 'সদিচ্ছা'গুলোকে মানুষের ওপর চাপাতে শুরু করলেন।

৭৭ সালে জ্যোতি বসু যে বলেছিলেন আমাদের মন্ত্রীরা ঠান্ডাঘরে বসে কাজ করবেন না, করবেন মাঠেঘাটে।... সেটি কাগজেই থেকে গেল। যার যেটা ভাল লাগল, ঘুরে এসে সেটাই চালু করতে গিয়ে হাস্যকর হয়ে উঠলেন। 'ই'-গভরনেন্স চালু হল, নজরদারিবিহীন, ঘটল কর্পোরেশনের টাকা গায়েবের ঘটনা... হাসপাতালে দুর্নীতি ঠেকানোর জন্য মাস্টার বোর্ড বসল, টেলি-মেডিসিন চালু হল, চালাবে কে? মন্ত্রী? আমলা? হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য আন্দোলনে যুক্ত, পরীক্ষিত ডাক্তারদের পরামর্শ চোথা কাগজের মতো ছুঁড়ে ফেলে স্বার্থান্বেষীদের খপ্পরে পড়ল স্বাস্থ্য দপ্তর... এক কথাতে প্রতিক্রিয়ার পুনরুভ্যুত্থানের সব শর্তই প্রস্তুত।

বয়স থাকলে, শরীর থাকলে হয়ত 'ক্রিয়া' দিয়েই মোকাবিলা করতাম। দেখলাম, এই পুনরুভ্যুত্থানে প্রথম শিকার হবে সি পি আই (এম)-এর সৎ, দক্ষ সংগঠকরা। সুতরাং ওঁরাই হয়ে উঠবেন প্রতিরোধী। আমার লেখার, বক্তব্যের টার্গেট শ্রোতা এবং পাঠক হবেন তাঁরাই, যাঁরা এই বিপদটা বুঝবেন, সংগঠিত করবেন, ঠেকাবেন। পারলে ওঁরাই পারবেন। অন্য বামপন্থী দলগুলো শ্রেণীর পরিবর্তে পার্টিকে সামনে এনে আসল বিপদটাই বুঝতে চাইলেন না। কৌশলসর্বস্ব হয়ে পড়লেন। মাওবাদীরা তাদের অন্ধ্রলাইন প্রয়োগ করাটাই শ্রেয় মনে করলেন। শাসকদের দ্বন্দ্ব কাজে লাগাতে গিয়ে নিজেরাই শাসকদের পচা অংশটার হাতে খেলে গেলেন। অন্ধ্রে বিপর্যয় থেকে কিছুই শেখেনি।

কৃষি থেকে শিল্পে উত্তরণ একটা অনিবার্য, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া... ইতিহাসে চলার পথে সেটা ঘটবেই। এটা ঠেকাতে যাওয়াটাই প্রতিক্রিয়া। বুদ্ধদেবের পরামর্শদাতারা যদি তাঁকে মাও-সে-তুংটা পড়াতেন! চেয়ারম্যান মাও বলছেন, ...জনগণের ওপর কিছু চাপিয়ে দেওয়া নয়।... একটা পরিকল্পনা, একটা কাজ প্রকৃতপক্ষে জনগণের কাজে লাগবে কিন্তু জনগণ বুঝছেন না, আমাদের ধৈর্য ধরে তাদের বোঝাতে হবে...' কিংবা হয়ত পার্টির রিপোর্ট ছিল 'জনগণ তৈরি'। বুদ্ধ জানতেন না পার্টি ইউনিটগুলো, সরকারি বিভাগে যেমন অধস্তনরা, 'বস'-এর মনের মতো রিপোর্ট দেন, সেইরকম রিপোর্টই দেয়। একটি সঠিক সিদ্ধান্ত, ভুলভাবে প্রয়োগ করতে গিয়ে হাতিয়ার তুলে

দিলেন প্রতিক্রিয়ার হাতে।... পুড়তে লাগল লালঝান্ডা। পুঁজিপতিদের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে মদত দিল গ্রামীণ প্রতিক্রিয়াকে...। লালঝান্ডা পুড়ছে... গ্রামে গ্রামে স্লোগান উঠছে 'লাল হটাও'। কৃষক উচ্ছেদ হচ্ছে।

...প্রাণের দাবি উপেক্ষা করি কী করে? হেঁকে বলি, সাবধান হও ভাইসব! সাবধান হও! ওরা আসছে।... হয়ত দালালি, হয়ত ওকালতি! কিন্তু কেন? ওই যে বললাম, 'প্রাণের দাবি।' মানুষখেকো জোতদার- জমিদারদের কর্তৃত্বচ্যুত করে যে-প্রাণ স্বমর্যাদাতে নিজেকে ঘোষণা করছে তার দাবি, দুশো আশিদিন মাতৃজঠরে বেড়ে উঠে যে ভ্রূণ শিশু হয়ে ভূমিষ্ঠ হতে চাইছে তার দাবি...

## দুই

'দগ্ধ হৃদয়ে যদিও ফেরাও ঘাড়
সামনে পেছনে কোথাও পাবে না পার
কী করে খুলবে মৃত্যু ঠেকানো দ্বার?...'

চারটে চ্যানেলে ছবি ভেসে আসে, তিনটে মৃতদেহ পড়ে আছে। কয়েক গজ দূরে জনাপঞ্চাশ লোক, গ্রামের মানুষের তুলনায় বেশ সুসজ্জিতই, তীর, ধনুক, টাঙ্গি, বন্দুক হাতে পাহারা দিচ্ছে দেহগুলো। কেউ যাতে সেগুলি সৎকার না করতে পারে! আকাশের শকুন আর চ্যানেলের মালিক... চোখ চকচক করে। পচছে, বেশ দেখা যাচ্ছে পিঁপড়ে আর মাছি...

চমকে উঠি, ওরা কারা? বিবস্ত্র গলিত শব কার? আনন্দে খবর বিতরণ করেন স্টার সাংবাদিক, কফি হাউসে, বারে সুশীল, হবু-সুশীলদের চাপা উল্লাস, জনতার ঘৃণা? কেন? ওরা দাসখত দিতে চায়নি। এলাকাতে থাকতে গেলে দাসখত দিয়ে বাঁচতে হবে। ওঁরা ফসল ফলাতেন, কাঠ কাটতেন, স্বাধীনভাবে বাঁচতেন, ওঁরা নাকি সি পি আই (এম) সমর্থক। পাঁশকুড়াতে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকটাও দাসখত দিতে চাননি, সাইকেল থেকে নামিয়ে পিটিয়ে মারা হল তাঁকে। বারাসতের সাংসদ পুরসভার নির্বাচনী সভাতে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, কে কে বামফ্রন্টকে ভোট দিচ্ছে আমাদের কর্মীরা নজর রাখছে। তাদের বাঁচানোর দায়িত্ব সি পি আই (এম) নেবে না। পিঠে পোস্টার লাগিয়ে ঘোরাব...

সি পি আই (এম) করে না, বরং দিদির ভক্ত-ই। নরেন্দ্রপুরের সিখণ্ডা গ্রামের শিবানি, বাবুদের বাড়ি কাজ করে, কাজের মেয়ে পুরসভা ভোটে জিতে ক্লাবের সদস্যদের নজর লাগোয়া তার বাড়িটাতে বেড়া ভেঙে, তার প্রতিবন্ধী মেয়েটাকে হেনস্থা করে হুমকি দিয়ে গেছে...।

মনে পড়ছে না অদূর অতীতের কথা। প্রতিক্রিয়া নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য ইতিহাসের পুনরাবর্তন তত্ত্বে বিশ্বাস করে। মমতার বরাবরের দাবি ছিল ৩৫৬ করে, ৭২-এর মতো নির্বাচন। মুসোলিনি, তিরিশ দশকের শুরুতে মাত্র ১৩ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। সে বিশ্বাস করত, যেহেতু গণতন্ত্রীরা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে উঠেছে, তাদের আরও দুর্নীতির ফাঁদে ফেলে, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আতঙ্ক জাগানো সন্ত্রাস চালিয়ে, নিরাপত্তা-বিধানকারী সংস্থাগুলোকে তাদের সংগ্রামভীরুতার মুসোলিনির ভাষাতে নপুংশকতার সুযোগ নিয়ে (মানে ট্রেড ইউনিয়ন, সোস্যাল ডেমোক্র্যাট পার্টি ইত্যাদির, যারা সব সময়েই জনগণকে বিশ্বাস ও আস্থা দিয়ে এসেছে, পরে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সামনে ঠেলে দিয়ে মাথা হেঁট করে ঘরে ঢুকতে বাধ্য করেছে), আন্তর্জাতিক পুঁজি, তার সঙ্কট কাটানোর জন্য রাজনৈতিক কর্তৃত্বের এই সুযোগ ছাড়বে না, তাঁর সাহায্যে, গোটা দেশে বিশৃঙ্খল অবস্থা তৈরি করা সম্ভব। নিরাপত্তাহীন মানুষ, নিরাপত্তা এবং স্বস্তির জন্য দলে দলে পার্টিতে আসবে।...

মুসোলিনির এই রণনীতির ফলে দু-বছর পরেই প্রায় আশি শতাংশ ভোট পেয়ে ইতালিতে আসে সে।

হিটলার তার আত্মজীবনীতে লিখেছে সংক্ষেপে, 'সন্ত্রাস! শারীরিক এবং মানসিকভাবে সন্ত্রস্ত করে তুলে, অনবরত ভীতিপ্রদর্শন করেই দ্রুত সংগঠন বৃদ্ধি করা যায়।'

লুম্পেনদের নিয়ে ব্ল্যাক-শার্ট তৈরি করে, বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতাদের নিকেষ মানুষের সংগঠিত হওয়ার মেরুদণ্ড ভেঙে দাও। গুজব আর অর্ধসত্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত কর। শর্তাধীন করে তোল একই মিথ্যা। একই ভাষাতে বারবার বলে তাকে সেটাই গ্রহণ করতে বাধ্য কর।

অর্থাৎ সংস্কৃত কথামালার সেই 'ধূর্ত আর পণ্ডিতের' গল্প। পণ্ডিত- পূজারী প্রতিদিন পুজোর পরে দেবীর পায়ে একটি করে পাঁঠা বলি দিত। চার ধূর্ত মিলে ঠিক করল ওই পাঁঠাটা নিয়ে ভোজ করবে। এরকম ভেবে তারা সিদ্ধান্ত নিল, প্রথমে পণ্ডিতের মনঃসংযোগ নষ্ট করে, সন্দেহ জাগানোর জন্য একজন থাকবে গঙ্গার ঘাটে। পণ্ডিত স্নান করে 'অজ-শিশুটি' কাঁধে করে যেই হাঁটবে, তখনই সে বলবে, ছিঃ পণ্ডিত, গঙ্গাস্নান করে সিঁদুর তিলক দিয়ে মায়ের নাম জপ করতে করতে এই ব্রাহ্মমুহূর্তে তুমি একটি সারমেয় কাঁধে কোথায় যাচ্ছ? সে সেইরকমই করে, পণ্ডিত হতভম্ব হয়ে যান, প্রতিবাদ করেন, বেশ জোরালো প্রতিবাদ। কিন্তু আর মায়ের নামে মনঃসংযোগ করতে পারেন না, ঘুরেফিরে লোকটার কথা মনে আসতে থাকে। অজ-শিশুটি কাঁধ থেকে নামিয়ে বারবার দেখেন, হাঁটতে থাকেন। হাঁটতে হাঁটতে ডানদিকে মোড় নিতেই

দ্বিতীয় ধূর্ত ঠিক একই কথা বলে। পণ্ডিত প্রতিবাদ করেন, কিন্তু প্রথমবারের মতো জোরালো নয়। হাঁটতে থাকেন, তাঁর মাথাতে ঘুরতে থাকে শুধু দুটো শব্দ— কুকুর? না পাঁঠা? বারবার পাঁঠার বাচ্চাটাকে নামিয়ে দেখতে থাকেন। চলার গতি শ্লথ, সেই দৃপ্ত পদক্ষেপ নেই, দু-দুজন লোক কি ভুল বলবে? ভাবতে ভাবতে তিনি বাম দিকে মোড় নেন। সেখানে থাকা ধূর্তটি তাঁকে তো পাঁঠাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে লোম, ঠ্যাঙ সব টেনে টেনে বুঝিয়েই দেয় 'দেখছেন না এর ল্যাজটা বাঁকা? কুকুরের ল্যাজ না হলে বাঁকা হয়?' পণ্ডিত মিনমিন করে বোঝাবার চেষ্টা করেন এই যে শিং উঠছে... ধূর্ত হো হো করে হেসে ওঠে, 'পণ্ডিত সত্যিই তুমি হাসালে, কোথাও নর্দমাতে পড়ে গিয়েছিল। লোমগুলো কাদা-জলে শক্ত হয়ে জমাট বেঁধে গেছে... ওগুলো শিং? তোমার মুণ্ডুতেই দ্যাখো শয়তানের শিং...

তাদের এই কথাবার্তার সময় চতুর্থ ধূর্ত সেখানে এসে জিজ্ঞাসা করে, কী ব্যাপার? তৃতীয় ধূর্ত তাকে বলে, 'দেখুন না, পণ্ডিত তিলক কেটে এই কুকুর বাচ্চাটা নিয়ে যাচ্ছেন, মায়ের ভোগ দেবেন বলে?...'

চতুর্থজন বিস্ময়ে চিৎকার করে ওঠে, 'বল কী হে! এ কী অনাচার! বাঁধো ওই পাপিষ্ঠকে, আমি গ্রামের লোক ডাকছি! ছিঃ ছিঃ এ কী অনাচার!...' পণ্ডিত ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে, নিজের পাঁঠাটাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে ওদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে আরও দু'জন ধূর্ত সেখানে এসে যায়। ওরা উদারতা দেখিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়। পণ্ডিত গঙ্গার দিকে পবিত্র হওয়ার জন্য রওনা হলে, পাঁঠাটি নিয়ে চম্পট দেয়...

এরকমভাবেই দশচক্রে ভগবানও ভূত হয়!

চমস্কি এটাকেই বলেছেন 'কনসেন্ট মেকিং' বা মত গড়তে বাধ্য করা। একচেটিয়া পুঁজি নিয়ন্ত্রিত মাধ্যম এবং শিল্প-সাহিত্য-ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখ্যা, নাটক সব দিয়ে তারা 'সাদাকে কালো' বলে প্রতিষ্ঠা করে জনগণের মত গঠন করে, নিজের 'মাল'। সওদা কেনায়! আধুনিক গণতন্ত্রও তাই। কখনই জনগণের স্বাধীন মতামত নয় সেটি। শর্তাধীন করে তুলে তার মত গড়ে দেয় পুঁজি নিয়ন্ত্রিত, খরিদ-করা মাধ্যম। আধুনিক শিল্প-সাহিত্য-নাটক-চলচ্চিত্র হল কনসেন্ট মেকিং ইন্ডাস্ট্রি। কখনও পণ্য বিক্রির জন্য মাল তৈরি হয়, কখনও মতামত তৈরির জন্য।

গাড্ডায় পড়া পুঁজিবাদের বেঁচে থাকার শেষ হাতিয়ার যুদ্ধ করে পৃথিবীটাকে ভাগবাঁটোয়ারা করে নিজের সঙ্কটটাকে সেই দেশের ওপর চালান করা। নিজের এবং অন্য দেশের সমস্ত প্রাকৃতিক, মানবিক, জাগতিক সম্পদ লুট করে নিজেদের মুমূর্ষু অবস্থাতে অক্সিজেন সরবরাহ করা। আবার মুনাফা গড়া।

গত শতাব্দীর তিরিশের দশকের সঙ্কট ওরা কাটিয়েছে এরকমভাবে। এই দখল করত গায়ের জোরে, নিজের দেশকে তৈরি করত সন্ত্রাস চালিয়ে। প্রতিরোধের বিষদাঁত উপড়ে ফেলার জন্যই নামিয়ে আনত সন্ত্রাস। সন্ত্রাস কথাটা রাষ্ট্রনীতিতে একটা ব্যবস্থা হিসেবে, হাতিয়ার হিসেবে আমদানি করে পুঁজিবাদ, রণনীতির রণকৌশল।

আজকের সঙ্কটে, মানে মহাসঙ্কটে পড়া ধনতন্ত্র, (এতদিন যাঁরা সমাজতন্ত্রের অবসানের সঙ্গে ইতিহাসেরও অবসান ঘটিয়েছিলেন, তাঁদের সকলকে হতাশ করে) বিশ্বব্যাপী মহাসঙ্কটে, দুটো বিশ্বযুদ্ধ। হিটলারের আত্মহত্যা করে পরাজয়, ভিয়েতনাম-সহ ইন্দোচীনে লজ্জাজনক আত্মসমর্পণ... এসবের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ বুঝেছে পুরনো কায়দাতে সঙ্কট থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ ডেকে এনেছে। একটার পর একটা দেশ তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। অথচ নিজের ছাঁচের জলেই যে নিজের গড়ে তোলা ইমারতের ভিতটা খাচ্ছে। এই ছাঁচের জলকে অন্যের উঠোন দিয়ে বইয়ে দিতে হবে। অন্যের উঠোন ভাসিয়ে নিজের বাড়ি বাঁচানো। তৃতীয় বিশ্বের ঘাড়ে এই সঙ্কটের বোঝাটা চাপাতে হবে। নিজের একটিই মাত্র শিল্প 'মৃত্যু উৎপাদন' (অস্ত্র) ব্যবস্থাটা চালু রাখার জন্য স্থানিক যুদ্ধ। আর দেশগুলোর সমস্ত সম্পদকে নিজের কাজে লাগিয়ে উদ্ধার পাওয়ার রণনীতি। অতীতের কায়দাতে নয়। এই অধিকার পেতে দেশগুলোর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বা রাষ্ট্র-পরিচালনাটা নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে তার মাধ্যমে এটা কর। তথাকথিত গণতন্ত্রের মাধ্যমেই এটা সবচেয়ে ভাল করে সম্ভব। দেশগুলোর মধ্যে প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে সংহত করে (ধর্মীয় গুরু, পীর-সহ), প্রতিরোধ গড়ার সম্ভাব্য শক্তিকে নিকেষ কর। সন্ত্রস্ত করে তোল জনগণকে যাতে তারা নিরাপত্তার জন্য এদের কাছেই আসে। 'সন্ত্রাসবাদ' একটা ঝোঁক থেকে, আন্তর্জাতিক লুম্পেনপুঁজির সব থেকে ভাল বিনিয়োগের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। যুক্তি সরবরাহের জন্য প্রস্তুত থাকা, মস্তিষ্কগুলো খরিদ কর। পুরনো ফ্যাসিস্তদের কিছু কৌশল, কিছুই তারা অনুসরণ করে। এটাই আধুনিক বাজারনীতি। এই 'কনসেন্ট মেকিং' কাজে যেখানে যাকে প্রয়োজন সৃষ্টি করে নাও। হোক সে ধর্মীয় সংগঠন, (ব্যর্থ হলে) 'মুখে বাম কাজে ডান' সংগঠন। এই সমস্ত দেশে শাসকদের ব্যর্থতা, গণতন্ত্রীদের দুর্নীতি আর ভারতবর্ষের মতো একটা দেশে প্রধান প্রতিরোধী ধারা 'বামপন্থীরা' অর্থনীতিবাদের চোরাবালিতে জনগণকে ঠেলে দিয়ে, অ-সচেতন, সংগ্রামবিমুখ, আত্মোন্নয়ন-ব্যক্তিস্বার্থসর্বস্ব জনসমষ্টিতে পরিণত করে, ওদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেই রেখেছে।

প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে, অর্থনৈতিক আন্দোলন আর অর্থনীতিবাদ এক নয়। জনগণকে সন্ত্রস্ত করে তোলার জন্য একদা-প্রতিরোধী এরাই হয়ে ওঠে 'সফট-টার্গেট', নির্বাচনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী...।

ভারতবর্ষে এটাই ঘটেছে। ভাবতে হবে যে ঝকঝকে ছেলেরা, দু'দিন আগে 'ব্র্যান্ড বুদ্ধ' চালু করেছে। তারা দলবদ্ধভাবে বিরোধী হয়ে গেল কেন? সঙ্কটে পড়া আমেরিকা 'আউটসোর্সিং' বন্ধ নীতি কার্যকর করতেই আত্মোন্নয়নকামী কৃতীরা নেমে পড়ল 'আমেরিকা বাঁচাও' স্লোগানকে আড়ালে রেখে প্রতিক্রিয়ার পুনরুভ্যুত্থান কাজে। ভারতের সমস্ত সম্পদের ওপর জনগণ যাতে বোতাম টিপে না-দাবি (এন ও সি) জানিয়ে দেন, সেই কাজে। অর্ধসত্য, মিথ্যা, দু-একটা ব্যতিক্রমী ঘটনাকে সাধারণীকরণ করে কাজে। অন্তর্ঘাতে।... সন্ত্রস্ত, বিভ্রান্ত জনগণ, পণ্ডিতের মতোই বিসর্জন দিলেন কাঁধের অজ-শিশুকে।

এখন ঘরে ঢুকে মাথা চাপড়াচ্ছেন, এ কী করলাম! এরা কারা? প্রশ্ন করছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার কৃষক, পূর্ব মেদিনীপুরে অধিকারী, মাইতি, মোল্লা পীরেরা রাজনৈতিক রক্ষাকবচে সুরক্ষিত হয়ে বর্গাদার কৃষকদের, তাদের জমিদারির খাস হয়ে যাওয়া জমি, যার পাট্টা পেয়েছিলেন ভূমিহীনরা, তাদের উচ্ছেদ করতে শুরু করেছে। উদ্ধার করতে নেমেছে নিজেদের জোত। সি পি আই (এম) উচ্ছেদের নামে জমিদারি কায়েম হচ্ছে।

## 'দালাল' না হয়ে থাকাটা মিরজাফরি!

টিভিতে দেখছি, ন'বছরের মেয়ের গলাতে জুতোর মালা। মিছিলে হাঁটছে, পেছনে সশস্ত্র কয়েকশো মানুষ! মেয়েটি হাত জোড় করে কাঁদছে আর বলছে, 'আমার মা-বাবা না সি পি আই (এম) করে,... আমি বারণ করব!... মেয়েটা হাঁটছে প্রখর রোদে, পেছনে গরু-ছাগল তাড়ানোর মতো একদল লোক নাচতে নাচতে তাকে খোঁচা দিচ্ছে... 'বল, বল... ওদিকে তাকিয়ে বল...'। এরা কারা? মানুষ? রাজস্থানে যে লোকগুলো অস্পৃশ্য মেয়েটা পিপাসাতে কুয়োর জল খেয়ে, কুয়োকে 'স্পর্শদোষে' দুষ্ট করেছে বলে ঠাকুর বেনিয়াদের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে মরেছিল, মনে পড়ছে না সেই দৃশ্য?

হ্যাঁ, সুশীলবাবুরা! আপনারা উল্লসিত, কারণ আপনাদের হৃদয়ে এখন লাব-ডাব শব্দ ওঠে না, ওঠে ডলার ডলার শব্দ! আপনাদের খুলির নিচে আছে মস্তিষ্ক নয়, সোনা! মেধাবী-কৃতীদের মাথায় লোহার রড মারলে বেরিয়ে আসবে রক্ত নয়, গলিত সোনা...

ওই মেয়েটা যে আমাকে দালাল বানিয়েছে! দালাল বানিয়েছে সুমিতা মণ্ডল, ওই যাকে আপনারা ধর্ষণ করে গাছে টাঙিয়ে রেখেছিলেন দৃষ্টান্ত হিসেবে। গণআদালতের রায় বলে!

তিনটে মানুষের লাশ পড়ে থাকতে দেখে মনে পড়ে যায় ৭২-এর কথা, থানাতে মা-বাবা শনাক্ত করতে পারেন না নিজের পুত্রের মৃতদেহ। ঘরে মেয়ে আর আরও একটা ছেলে আছে না? মনে পড়ে যায় ডায়মন্ডহারবারের নদীর চরে পরপর শুয়ে আছে পাঁচ যুবকের মৃতদেহ। ওখানকার বর্তমান সাংসদ গলা ফাটিয়ে এখনও বলেন, ওরা জনরোষের, জনগণের ঘৃণার প্রতীক! সেদিনকার অ্যাক্টিভিস্টরা আজ সংবিধানের রক্ষাকবচে রক্ষিত। কীসের পদধ্বনি!

৭২ ছিল শহরকেন্দ্রিক, তাড়াতাড়ি প্রচার পেয়েছিল। সন্ত্রস্ত মানুষ গ্রামে চলে গিয়ে পাল্টা আঘাত হেনেছিল। সেদিন সাম্রাজ্যবাদ কমিউনিস্টদের প্রভাব কমাতে গড়ে তুলেছিল সন্ত্রাস। এবার? ওদের শুরু গ্রাম থেকে। সব থেকে নির্মম, নিষ্ঠুর শ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক শক্তিকে সংহত করে, পীর আর ঠাকুরদের সামনে রেখে, উদ্দেশ্য, মানুষের মস্তিষ্ক থেকেই স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র নামক বস্তুগুলোকে শেষ করা। সুশীল-সুশীলা আর এন জি ও-দের দাপাদাপি তাই এত বেশি। ইতিহাসের পুনরাবর্তনে ওরা বিশ্বাসী।

ওরা জানে না ইতিহাসের পুনরাবর্তন ঘটে দু'বার। প্রথমবার প্রতিক্রিয়ার মুখে হাসি ফুটিয়ে, কমেডি হিসেবে, দ্বিতীয়বারে আসে ওদের চিরদিনের জন্য কাঁদাবার জন্য। (সেদিন ৭৭-পরবর্তীতে যেমন জামা পাল্টিয়ে বেঁচে গিয়েছিল, আর পারবে না।) প্রতিক্রিয়ার পুনরুভ্যুত্থানের যুগে মার্কস-বলা কথাগুলো মনে করিয়ে দেওয়ার দালালি তো করবই।

'শ্বেতসন্ত্রাসে'র দাপাদাপির সময়ে লেনিন-স্তালিন যে লাল-সন্ত্রাস গড়ে তোলার আহ্বান দিয়েছিলেন, সেটা মনে করিয়ে দেওয়ার দালাল তো বটেই। ফ্যাসিবাদের পদধ্বনির সময়ে জর্নি ডিমিট্রভের 'ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা এমনকি প্রগতিপন্থী উদার ধর্মগুরুরাও সহযোগী'... এটা মানার দালালি করবই, কারণ— 'বন্ধু: বন্ধু তোমরা তো আমাকে দেখেছো আমার মনের মন্দিরে/হাড় কালি হ'ল, তবু শাসাতে নারিনু এ পোড়া মন-বন্দীরে!'

## দ্বিতীয় পর্ব

সেই শিকড়ে জীবন বাঁধি..

অর্থনীতি

সত্যিই তো, 'ঘৃণার পাতা হাওয়ায় ঝরে, ঘৃণার মাটি প্রখর ভালবাসা,' সেই শিকড়েই তো বেড়ে উঠেছি, ভাই...

'মানুষ তো ছার, সিংহও নয়, মানুষ কাকে, শিরদাঁড়া নেই, দেব না ওকে ঘৃণারও অভিশাপ।' শিরদাঁড়াবিহীন মানুষগুলোকে যে ঘৃণা করব এত নিচে নামতে পারব না।

টিকটিকির ল্যাজ কেটে গেলে নাকি আবার পরিবেশ পরিবর্তনে ল্যাজ গজায়, গিরগিটি রঙ পাল্টায়। বাচ্চা বয়সে সবুজ গিরগিটিকে দেখতাম কেমন করে বেহায়ার মতো চোখে চোখ রেখে আস্তে আস্তে লাল হয়ে যাচ্ছে। দিদির ভয়ঙ্কর ভয় ছিল টিকটিকি, গিরগিটিতে। হাত ধরে টান মারত, 'পালিয়ে আয়, দেখছিল না ওটা রক্ত চুষে নিচ্ছে... তাই লাল হয়ে যাচ্ছে।' ভয় পেতাম না। একটু ঠ্যাটোই ছিলাম। গিরগিটিটার চোখে চোখ রেখে মনে মনে বলতাম, দেখি তুই কত রক্ত চুষতে পারিস! যতই রক্ত চুষিস একটা ঢিল মারলেই তো পালাবি! সেই থেকেই বুঝি মস্তিষ্কে একটা স্থায়ী পরাবর্ত তৈরি হয়ে গিয়েছিল রঙ বদলানোদের ঢিল মারা। অসুস্থ বন্ধু ব্যবসায়ী, অপকারী নন, ব্যবসায়ী নিয়ে গিয়ে হাজির করল রাজভবনের পেছনে মন্ত্রী আবাসনে। এক মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল, 'এই যে দুই সৎ মানুষের সঙ্গে মিলন ঘটালাম। নগরোন্নয়ন মন্ত্রী... মন্ত্রী আধুনিক শহরের সমস্যা এবং গ্রাম শহরের ফারাক কমিয়ে আনার সমস্যা নিয়ে লেখা একরাশ বইপত্তর নিয়ে ব্যস্ত। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এঙ্গেলস পড়েছেন?' নির্বিকার উত্তর, 'না'। ওনার 'না' বলার ধরন দেখে বুঝলাম, লোকটা ভন্ড নন, জানার ভান করেন না। অবাকও হলাম, একজন মার্কসবাদী বলে দাবিদার, আধুনিক শহর, আধুনিক সমরবিদ্যার বিবর্তন সম্পর্কে এঙ্গেলস না পড়ে সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করেন কী করে? বিবর্তনটাই বুঝতে পারবেন না। সামান্য আলোচনা করলাম। উল্লেখ করলাম, প্যারিকমিউনের পর আধুনিক শহরের ধারণা কেমন করে পাল্টেছে। রাস্তা-যুদ্ধের হাত একে বাঁচার জন্য, আর দ্রুত রসদ আর কাঁচামাল দেওয়া-নেওয়ার জন্য দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত জোড়ার কাজ করে। অবাক হয়ে শুনছিলাম তাঁর কথা। বললাম, 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবটা না করেই গ্রাম-শহরের পার্থক্য কমে যাবে নাকি? মাটির ভিতের ওপর চোদ্দো তলা বিল্ডিং! ভূমি সংস্কার মানে কতগুলো জমির পাট্টা দেওয়া নয়। উৎপাদন সম্পর্কটা পাল্টানো। না হলে কৃষককে আরও লোভী এবং মোহগ্রস্ত করে তুলবে। ভূমিহীন কৃষক এক বিঘে জমি পেলে দরিদ্র কৃষকে রূপান্তরিত হবে... খুদে মালিকের চরিত্র পাবে... শ্রেণী অবস্থানের এই পরিবর্তন তাকে আগ্রাসী করে তুলবে। অন্যেরটা পেতে চাইবে। কোনও সন্দেহই নেই এতে প্রথম প্রথম উৎপাদন বাড়বে, গ্রামে কর্মদিবস তৈরি হবে, গ্রামের লোকের হাতে পয়সা আসবে। সুতরাং সেই পয়সাগুলো আত্মসাৎ করার জন্য কোম্পানি, তা সে অন্তরদেশীয়ই হোক, আর আন্তর্জাতিকই হোক, কিংবা বহুজাতিকই হোক তারাই রাস্তাঘাট তৈরি করবে... গ্রামীণ বাজার ধরার জন্য। ষাট টাকার এক ফাইল তেল বা

শ্যাম্পু এক টাকা/দু'টাকার স্যাসেতে ভরে আশি টাকাতে বিক্রি করবে। রিঠা, সোডা, গোলা-সাবান জায়গা ছেড়ে স্মৃতিতেই থাকবে। শহরের এই পণ্য, সঙ্গে করে নিয়ে যাবে শহুরে ভোগবাদ। গ্রাম হারাবে তার সরলতা, সহজ জীবন। আবার যেহেতু খুদে, উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পর্কে সম্পর্কিত লোকগুলো, তাদের মানসিক অবস্থান খুদে উৎপাদকদের সঙ্কীর্ণতাতেই থাকছে। অর্থাৎ শহরের লোভ, প্রত্যাশা আর লুম্পেসির সঙ্গে খুদে উৎপাদকের সঙ্কীর্ণতা মিশে গ্রাম হয়ে উঠবে, না ঘোড়া, না গাধা, মাঝখানে খচ্চর! দো-আঁশলা। পার্থক্য তো কমবেই না, বিপরীতে গ্রাম্য-সরল জীবনে নেমে আসবে বিপর্যয়। মন্ত্রীর সৎস্বপ্ন আর সদিচ্ছা শুনছিলাম, টেবিলের ওপর রাখা বইগুলোর নাম দেখছিলাম আর ভাবছিলাম ওঁরা ভুলে গেছেন। দেশ-বিদেশ ঘুরে ওঁদের মাথা ঘুরে গেছে। ওঁরা আধুনিক চীন দেখছেন, ভুলে গেছেন দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের পথ অতিক্রম করার প্রতিটি পর্বে চীনা জনসাধারণ পুরনো উৎপাদন সম্পর্কটা ভেঙে ফেলার সংগ্রাম। একবিংশ শতাব্দীর চীনের ভিত যে ১৯৪৯ সালে তৈরি হয়েছিল সেটা ভুলে গেছে। ভুলে গেছে চীনের কমিউন ব্যবস্থা। কমিউন ব্যবস্থা কত ব্যর্থ, সে সম্পর্কে এরা সাহেবদের সমালোচনা যত পড়েছেন, ততই ভুলে গেছেন কাকাবাবুর (মুজফ্ফর আহমেদ) সেই বিখ্যাত উক্তি, 'কমিউন ব্যবস্থা, লাল চীনকে এক নতুন অর্থনীতির ভিত করে দিচ্ছে।' তার স্বপ্ন ভঙ্গ করলাম না সেদিন। তবে বুঝে এসেছিলাম গ্রামগুলো হয়ে উঠতে চলেছে ক্রিমিনালদের পশ্চাদভূমি। কে এদের বোঝাবে গ্রামোন্নয়ন হলে, পরিকাঠামোটা ব্যবসায়ীরা নিজেরাই গড়ে নেবে। সামান্য পরিবর্তনেই যে হাজার হাজার কোটি টাকার বাজার তৈরি হয়েছে সেই বাজারটা ধরার জন্যই ওরা চাইছে পরিকাঠামো... অর্থাৎ জনগণের ঘাড় ভেঙেই তৈরি হোক রাস্তাঘাট, এটা পুঁজিপতিদের কাজ। অবশ্যই প্রান্তে পড়ে থাকা জনগণের তাতে সুবিধা হয়। কুড়ি টাকা শ নারকেল চারশো টাকা শ-এ বিক্রি করতে পারে বাগানের মালিক। কিনতে পারে গোলা সাবানের পরিবর্তে ডিটারজেন্ট পাউডার। রিঠার পরিবর্তে সার্ফ এক্সেল। সাঁওতাল মেয়েটা আব্দার করে লিরিল আছে রে বাবু! পরিবর্তন ঘটে। রূপান্তর ঘটে কি? ওঁদের মানে একজন মার্কসবাদীর স্বপ্ন তো রূপান্তর ঘটানো। রেডিমেড একটা রাষ্ট্র যন্ত্রের যন্ত্রাংশের ড্রাইভার হয়ে সে কাজ কতটা হবে...

দেখা যাক, শেষ কথা বলে কিছুই হয় না। এটাই তো মার্কসবাদ। বাঁধা পথে চলে না, পথ তৈরি করে নেয়। সেই পথের বাঁকে বাঁকে কত বিষধর ফণা উঁচিয়ে থাকে, কত শ্বাপদ; মনে মনে বলে এলাম, হয় না, হবে না। ওই ব্যবসায়ীকুল যতদিন চাইবে, ততদিনই তোমরা এখানে সরকারে থাকবে। দেশের একটা অংশ ওরা তোমাদের ছেড়ে দিয়ে দেখাবে তোমরা ব্যর্থ। লাল ঝান্ডাটা ধুলাতে গড়াগড়ি যাবে। এই

ব্যবসায়ীটাও থাকবে না তোমার সঙ্গে বন্ধু। তারা ফিরে যাবে তাদের অবস্থানে। বেছে নেবে লুম্পেন, ক্রিমিনাল, আর লুম্পেন-পুঁজির প্রতিনিধিত্বকারী দলকে। গ্রামে গ্রামে বিধায়ক, সাংসদদের তকমা ঝুলিয়ে জোতদার, জমিদাররা আবার ফিরে আসবে।

শতবর্ষে পড়েছেন কবি বিষ্ণু দে, আবার নতুন করে তাঁকে পড়বে আমাদের মতো কেউ

এ নরকে
মনে হয় আশা নেই, জীবনের ভাষা নেই
যেখানে রয়েছি আজ সে কোনও গ্রামও নয়, শহরও তো নয়,
প্রান্তর পাহাড় নয়, নদী নয়, দুঃস্বপ্ন কেবল,
সেখানে মজুর নেই, চাষী নেই
যেখানে রয়েছি আজ মনে হয় আশা নেই,
বাঁচবার আশা নেই, বাঁচাবার ভাষা নেই,
সেখানে মড়ক অবিরত
সেখানে কান্নার সুর এক ঘেয়ে নির্জলা আকালে
মরমে পশে না আর, সেখানে কান্নাই মৃত
কারণ কারোরই কোনও আশা নেই
অথবা তা এত কম, যে কোনও নিরাশা নেই।
চৈতন্যে মড়ক।

এক দুঃস্বপ্ন দেখতে দেখতে সেদিন বেরিয়ে এলাম মন্ত্রীর ঘর থেকে। ভরসা বলতে এখনও মানুষ 'নিরাশ হয়'! রেগে যায়। ঠিক এই ঘটনার তিন মাস পর...। হঠাৎ ফোন, বন্ধুর কণ্ঠস্বর, একতরফা বলে গেল, মানে একেবারে কল্যাণ ব্যানার্জি, মদন মিত্র, মমতা ব্যানার্জির ভাষাতে খিস্তি করে গেল, না আমাকে নয়, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, অশোক ভট্টাচার্য, প্রকাশ কারাতকে। শেষে সিদ্ধান্ত, প্রকাশ সি আই এ-র লোক। বুঝলাম, মমতার ঢঙ রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছে। একতরফা চিৎকার করে যাও, গু-গোবর ছেটাও। বিরোধীপক্ষ হতভম্ব হয়ে ভাবে, 'এ আবার কী কথা!' সেই ফাঁকে কিস্তিমাত করো, জেলে দেখতাম পাগলি ঘণ্টা বাজলে ফোর্স ঠেকানোর জন্য মল-মূত্র মাখানো কাপড় ছোঁড়ার কৌশল। নোংরা গায়ে লাগার ভয়ে, ঘেন্নাতে ফোর্স পিছিয়ে যেত।

এক দাম্পত্য কলহের সাক্ষী হওয়ার দুর্ভাগ্য হয়েছিল একবার, বেচারা পুরুষ! তাঁর স্ত্রী চিৎকার করে প্রমাণ করেই ছাড়লেন, উনি ব্যভিচারী। প্রতিপক্ষকে কথা বলার সুযোগই দিও না। যুক্তি নয়, পশু যুক্তি, তার কথার কী প্রতিবাদ করব? শুনে

গেলাম, কারণ আমি ভাল শ্রোতা। শেষ কথাটার উত্তরে শুধু বললাম, 'ভালই তো। সি আই এ-র লোক যদি ভারতকে আমেরিকার দাস বানানোর প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে, ব্রিটিশ কাগজের মতে ভারতের সবচেয়ে শক্তিধর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের তকমাটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে, সেটা তো ভালই। অনেক ছোট, কিশোর সেই ছেলেটার মুখটা মনে পড়ল। সংযত করলাম নিজেকে... কী বুঝল জানি না। সে কিন্তু বলেই যেতে থাকল, বুঝলাম কোনও একটা প্রত্যাশা পূরণ হয়নি ওর। ওর রাগের কারণ হয়ত সেটাই। আশা এখনও আছে। আমি রাগি না কারণ আমি জানি রেডিমেড একটা রাষ্ট্র নয়, রাজ্য নিয়ে ক্ষমতাবিহীন সরকারে থেকে মৌলিক জনগণের মৌলিক সমস্যার কোনও সমাধান করা যায় না। হাজার বাধা। এরকম একটা সরকার মানে খুঁটোতে বাঁধা গরু। দড়ি যতদূর যাবে ততদূরই ওদের সীমা। তাই রাগি না। কিন্তু...।

হ্যাঁ, কিন্তু আছে। এত মানুষের এত ত্যাগ, এত রক্তের বিনিময়ে অর্জিত সাফল্যগুলো যদি ছলেবলে কৌশলে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়, শত শহিদ কানের কাছে গুনগুন করে, শহিদের খুনে রাঙা পথে দ্যাখো হায়নার আনাগোনা... ভেঙেচুরে চুরমার হয়ে যাওয়া হাতটা মুঠো করে চিৎকার করি, 'নো পাসারন। এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়ব না। লাল পতাকা পুড়ছে, লাঞ্ছিত হচ্ছে দেখলে মনে পড়ে সেই বোকা বুড়োটার কথা, ভারতের ওপর চেপে বসা চার, চারটে পাহাড় সরিয়ে দিতে নেমেছিলেন, স্বপ্নালু সেই উজ্জ্বল চোখ, দৃঢ়বদ্ধ চিবুক, চোখের ওপর ভেসে ওঠে, তিনি বলে চলেছেন, 'নিজেদের ওপর আস্থা রাখো। কারণ, তোমাদের আছে বিপ্লবী ঐতিহ্য।' মনে পড়ে তিনি বলছেন, 'শ্রমিক কৃষক ওদের নয়, আমাদের। একটা শ্রমিকের গায়ে গেরুয়া, তে-রাঙা, যে কুর্তাই থাকুক তিনি আমাদের। ... আমরা তার কাছে পৌঁছুতে পারিনি। এটা আমাদের অক্ষমতা, অপদার্থতা, বিপরীতে একজন জোতদার, মহাজন, পুঁজিপতি যদি দশটা লাল জামা পরে, তোমার পেছনে ঘুরে, ভ্রু-কুঁচকাবে, সে তোমার সম্ভাব্য শত্রু! বুদ্ধিজীবীরা ভাসমান পদার্থ, যাবে, আসবে। শক্তি দেখলে আসবে, অসুবিধা কিংবা ত্যাগের প্রশ্ন এলে চলে যাবে! জোয়ারে ভাসে... প্রতিক্রিয়াশীলরা গুণ করে, আর ওরা যুক্তি সরবরাহ করে।...'

'লাল ঝান্ডা কার হাতে আছে বড় কথা নয়, লাল ঝান্ডা লাঞ্ছিত হতে দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ো, তোমার রক্তে আরও লাল হয়ে উঠুক সেটা!'

লাল ঝান্ডা পুড়ছে, আদিবাসী গরিবস্য গরিব খেতমজুরের লাশ পচছে...! জোতদার-জমিদাররা, অধিকারী-গায়েন-ভুঁইয়া-বাপুলিরা সি পি এম উচ্ছেদের নামে, বর্গাদার আর পাট্টাধারী কৃষকদের উচ্ছেদ করে নিজেদের খাস হয়ে যাওয়া জমিগুলো পুনরুদ্ধার করছে! এটা নাকি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বিরোধী সংগ্রাম! দালাল না হয়ে উপায় আছে?

আনপেইড দালালি! পঞ্চাশ হাজারি মনসবদার নই। হার-হাইনেসের কিংবা 'হের ম্যাডাম'-এর (ম্যাডামের আগে কি 'হের' চলে সুমন? যাই হোক উনি তো বলেই থাকেন উনি 'নারী' বলে দাবি করেন না) অন্নদাস হতে পারব না।

এগুলো ভেবে চলেছি, আর ফোনের ওপ্রান্ত থেকে ভেসে আসা কথাগুলো শুনছি, ... 'তোমার বুদ্ধদেবের থেকে মোদি অনেক ভাল।' বুঝলামযে অব্যক্ত কথাটার মর্মার্থ বুঝে নিতে অসুবিধা হল না। বললাম, 'বটেই তো, আই ডু অ্যাডমিট ইট। বুল-বুল-এ-হিন্দ আর মহাকবি গুজরাটির কবর তথা স্মৃতিসৌধ ধ্বংস করে মোদি পারে রাতারাতি ২৪ ফুট চওড়া রাস্তা করে দিতে! বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ জমি বিনা পয়সাতে টাটাকে দিয়ে দিতে! ... ভাল তো বটেই!...

... ও সব তোমাদের ছেঁদো কথা বাদ দাও...

ঠিক ওর মুখ থেকে এই কথাটা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। ছেঁদো কথা? বেস্ট বেকারির তন্দুরে চার-চারটে মানুষকে ঢুকিয়ে হত্যা করাটা ছেঁদো কথা? গর্ভবতী মায়ের পেট চিরে 'বাবর-কা আওলাদ' (বাবরের বংশধর)-কে ত্রিশূলে গেঁথে ঝলসে বাবার সামনে আগুনে ছুঁড়ে দেওয়া... ছেঁদো কথা? মহাশ্বেতা দেবীকে তো বিমান ভাড়া দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, নিজের থেকে আদৌ যাননি... ছেঁদো কথা? বুঝলাম কীসের ভরসাতে মমতা ব্যানার্জি বিশেষ বিমানে বিশাল ফুলের বোকে পাঠিয়ে মোদিকে অভিনন্দন জানাতে পারে। মমতা না জানলেও তার থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক অরুণ জেটলিরা জানত বামফ্রন্টের মধ্যেই একদল আছে যারা ঠিক সময়ে বেরিয়ে আসবে...

... শোনো, কে ভাল, কে মন্দ বিচারে যাচ্ছি না, আসল কথাটা বল তো বাবা কী চেয়েছিলে? কী পাওনি?...

ও-প্রান্ত ফাঁদে পা দিল। ... আমাকে ফেবর করে, মানে সুবিধা পাইয়ে ওরা পঁচিশটা মাড়োয়াড়িকে জমি দেওয়ার রাস্তা করে নিয়েছে।'

... তোমাকে জমিটা না দিলে বোধহয় মাড়োয়াড়িদের জমি বিক্রি করতে পারত না? এত শক্তিশালী নাকি তুমি? করো তো ট্রেডিং, এখনও উৎপাদক হতে পারোনি, আশা করেছিলাম বেনিয়া নয়, তুমি শিল্পপতি, উৎপাদক হও! তা সে মোদির দেশেই হোক, এখানেই হোক। শিল্প উৎপাদক হিসাবে তোমার বিকাশ ঘটুক। গেরস্থের অনুপস্থিতিতে সোনাটাকে পেতল বলে কিনে এনে সোনার মূল্যে বিক্রি করে পয়সা কামানো নয়, সম্পদ সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি ভোগ করে বড়লোক হও। সৎ চুক্তিতে আস। চুক্তি কর শ্রমিক-কর্মচারী-প্রযুক্তিবিদদের সঙ্গে, বাপু হে আট ঘণ্টা খাটাব, তিন ঘণ্টা তুমি নিজের জন্য খাটবে, বাকি পাঁচ ঘণ্টা আমার। রাজি থাক তো এস...। বেনিয়াই হয়ে রইলে বাপু, উৎপাদক হলে না, খেপে গেলে 'সত্যম'-এর

জালিয়াতি ধরা পড়তে! বাংলাতে বসে আট ঘণ্টা বলে ১৬ ঘণ্টা খাটালে বাধা আসে তোমার ভেতর থেকেই, তোমার মৃত পিতা এসে হাজির হন তোমার সামনে, তাই না? এখানে মেয়ের বয়সী মেয়েদের সামনে ভিড়িয়ে যারা বাণিজ্য করে, তোমার 'তুমি' বাধা দেয়। জানি দিতে বাধ্য। পার না তুমি, পিতৃসম ব্যবহার দিতেই অভ্যস্ত। স্থান-কাল-পাত্র পরিবর্তনে নিজেকেই পাল্টাতে পারতে। সোজা কথাটা সোজা বল। সোজা ব্যাটে খেল। হায় তেং।

দেখছি লাল পুঁজি মালিকরা সবুজ হচ্ছে। মেটে গিরগিটিটা প্রথমে লাল হয়ে, আত্মরক্ষার পরিবর্তে সবুজ হয়ে যাচ্ছে... পাতার সঙ্গে মিশে যেতে পারবে ... তুমি আমার ওপর রাগ করলে আজিজুলদা? ... না রে! কষ্ট হচ্ছে। এই মহামন্দার কবলে পড়েছ, বুঝতে পারছি। ব্যবসা কেমন চলছে?

... নাভিশ্বাস উঠেছে।

... বুঝতেই পারছি। শুধু আর পাঁচজনের মতো

আমেরিকা আউটসোর্সিং বন্ধ করেছে বলে লাল ঝান্ডাটা পরিত্যাগ কোরো না..., মাথায় রেখ লাল ঝান্ডা আক্রান্ত! দোষ তোমার নয়, লাল ঝান্ডা এক হাতে ধরে যখন কেউ বাধ্যবাধকতার নাম করে, ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট নিধনে মূল পুঁজি সরবরাহকারীর সঙ্গে অন্য হাত মেলায়। ঘোষণা করে, জীবনের শ্রেষ্ঠতম দিন, সংশয় জাগে। ব্যক্তির বিশ্বাসযোগ্যতাটাই প্রশ্নের মুখে পড়ে.... সেই সুযোগে গাড্ডায় পড়া পুঁজিবাদ লুম্পেন শক্তিকে সংহত করে আক্রমণ করে, ব্যক্তিটিকে নয় লাল ঝান্ডাকে। শত্রু-মিত্র চিনতে ভুলো না স্যাঙাত; ওরা সত্যবাদী নয়, ওরা সুবিধাবাদী।

শত্রু মিত্র যে যখন ভুঁয়ে লোটায়
ওরা তার মাংস খায়, রক্ত চোষে....
ও প্রান্ত চুপ! 'কী কেটে দিলে নাকি?'
— না বলে যাও! তুমি বলবে আর ফোন কেটে দেব?
— ন্ না কাটতেই পার, আমি তো সি পি এমের দালাল!
— কোন্ শালা বলে! জিভ ছিঁড়ে দেব!

এ প্রান্তে হাসলাম, 'ন্ না সত্যিই দালাল, তবে সি পি এমের নয়, লাল ঝান্ডার। তোমার হাতের লাল ঝান্ডাটাও যদি আক্রান্ত হয়, আর অধিকারী, বাপুলিরা যদি সেই সুযোগে গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে আবার ফণা তুলতে চেষ্টা করে, আমি তোমারও দালাল। আচ্ছা বল তো আমার থেকে বেশি সি পি এমের অবরোধের মুখে তোমরা পড়েছ?

— না, জীবিতদের মধ্যে কেউ নয়?

একটু থেমে সে আবার বলে, 'তোমার ওপর রাগ হয় কেন জান?'

— বল।

— তুমি পার্টিটা করবে আবার?

একটা দীর্ঘশ্বাস বুক চিরে বেরিয়ে আসে, মৃত্যুর আগে আমার ছেলেটাও এই দাবি করত, 'বাবা, আমাদের জন্য তুমি আবার পার্টিটা কর!'

তাকে যে উত্তর দিয়েছিলাম সেটাই বললাম, 'আবার একটা দোকান? জনগণকে বিভক্ত করা? না।'

— কিন্তু আমাদের মতো অনবরত সংশয়ে যারা দুলছি, তাদের পথ দেখাবে কে?

বললাম, 'সংশয়ে যাকে আমরা ত্যাগ করেছি, সন্দেহে যাকে আমরা খুন করেছি, নিজের মৃত্যু দিয়ে তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী। তাঁকে খোঁজ!....

ওদিকে বোধহয় আর কোনও ব্যবসা সংক্রান্ত ফোন এসে গেছে। 'আজিজুলদা, আজ রাখছি, একদিন যাব।'

— এসো...।

তাই বলে কী করব ঘৃণা সমানে সমানে বিনা?
'পায়ের পাশে ঘুরতে পারে সাপ,
আশপাশে চৌকাঠে বা ঘরের কোণেও বিছা বা জোঁক,
প্রাণের লোকে না-ই থাকুক বাসা,
এটাও ঠিক যে সাপ মাড়ালে ঘৃণায় শরীর রি-রি করে,
পড়তে পারে জুতোর চরম চাপ,
তাই বলে কি বিছাটাকেই বসতে দেব ঘৃণার আসন,
জোঁককে শেষে ডাকব সভাঘরে?

দেখলাম বিগত চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনে প্রচারের শেষ দশদিন কেমন করে সমস্ত উদ্যোগ বেরিয়ে গেল সরকারি বামদের হাত থেকে। বুদ্ধদেব জোঁককে সভাঘরে ডেকে এনে যে লাল পুঁজিপতিদের (বড় ক্যাপিটালিস্ট) একটা সম্প্রদায় তৈরি করেছিল। আমেরিকার সঙ্গে রণনৈতিক চুক্তি এবং পারমাণবিক চুক্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে তারা কেমন প্রথমে ফিস ফিস করে পরে সোচ্চারে সবুজ গিরগিটি হয়ে গেল! মার্কিন রাষ্ট্রদূতের প্রত্যক্ষ সরাসরি নেতৃত্বে এফ বি আই সদর স্তর, 'ভারতীয় র'-এর সক্রিয় সহযোগিতাতে জনমত গড়তে আসরে নামল। আগুনে ঘি ঢাললেন হিলারি ক্লিন্টন। রাষ্ট্রীয় কূটনৈতিক ভ্রমণে এসে অপ্রাসঙ্গিকভাবে ঘোষণা করলেন, আউটসোর্সিং বন্ধ। ভারতের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পর এ সমস্ত প্রশ্নে ভাবা যাবে। নির্বাচনের দশ

দিন আগে এই ঘোষণার মানে পরিষ্কার! কংগ্রেস ক্ষমতাতে না-এলে, এখানকার ছেলে-মেয়েদের আমেরিকার সংস্থাগুলোতে নিয়োগ বন্ধ হয়ে যাবে। ব্যবসা মানে ব্যবসায়িক লেনদেন বন্ধ হয়ে যাবে।

বুদ্ধদেব সরকার শহুরে মধ্যবিত্তদের 'চিত্তজয়ে'র জন্য যে তথ্য-প্রযুক্তি, শিল্পোদ্যোগ নিয়ে বাজার মাত করবে ভেবেছিল, যারা 'ব্র্যান্ড বুদ্ধ' চালু করেছিল, প্রত্যেকেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সক্রিয় বিরোধিতায়। মধ্যবিত্ত, মানে 'কৃতী' যুবকদের প্রায় নব্বই শতাংশই, দু'দিন আগে পর্যন্ত যারা 'ব্র্যান্ড বুদ্ধ'-র ব্যান্ড বাজাত, সরাসরি ময়দানে নেমে পড়ল। 'রেড ক্যাপিটালিস্ট' মানে কমিউনিস্ট দরদি বলে চিহ্নিত পুঁজিপতি বা টাকার মালিকরা তাদের মুৎসুদ্দি চরিত্র নিয়ে ময়দানে হাজির হল: বুদ্ধদেবের আদর করে ডেকে আনা 'ফিকি', ফাঁকা হয়ে গেল! এটাই স্বাভাবিক, কারণ, এই সমস্ত ব্যবসায়ী মূলত তিনটে কারণে আমেরিকা বা বিশ্ব পুঁজিবাদী সংস্থার ওপর নির্ভরশীল: (ক) পুঁজি, (খ) বাজার, (গ) নিরাপত্তা। এগারজনো এস পি-কে দেখলাম। গ্রামে গ্রামে জিপ নিয়ে ঢুকে 'তাফাল' করে বেড়াতে। 'বাম' সমর্থক, সংগঠক এবং সক্রিয় কর্মীদের ভীতি প্রদর্শন, গ্রেফতার, আর হেনস্থা করার মধ্য দিয়ে তারা পরিষ্কার নির্দেশ পাঠাল এদের ভোট দিলে কপালে দুঃখ আছে। দু'চারজন তো সরাসরি প্রচারেই নেমে গিয়েছিল। সবই চলল গণতন্ত্রের নামে। নির্বাচন কমিশনের নামে। ইরাকে নিযুক্ত ছিল এমন একজন মার্কিন সামরিক পরামর্শদাতা ঘাঁটি গেড়ে বসল দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং বাঁকুড়াতে। চারটে দৈনিক কাগজ, প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া টিভি চ্যানেলগুলোকে কোটি কোটি টাকা দিয়ে পুনরুজ্জীবিত করে ময়দানে নামানো হল এক মিথ্যা, একই ভাষায় বলে যাওয়ার কাজে। ওদের সাংবাদিকদের খবর তৈরি করার কাজে লাগানো হল। এস পি এবং থানাগুলোর বেশিরভাগ বড়বাবু আই সি-কে লাগানো হল মাস্তান, লুম্পেন বাহিনী সংগঠিত করার কাজে। '৭৮ সালের পর বাংলার গ্রামাঞ্চল থেকে যে জোতদার-জমিদার, সুদখোর এবং গ্রামীণ ফাতরাগুলো সামাজিক কর্তৃত্ব হারিয়ে গর্তে ঢুকেছিল, বসন্তের এই বাতাসে তারা বেরিয়ে এল, এতদিন ধরে তারা কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারের যে স্বপ্ন দেখছিল, সরাসরি মার্কিন মুলুক, আর 'র' এগিয়ে এল সেই স্বপ্ন পূরণ করতে। জাতীয় কংগ্রেস প্রণববাবুর মতো ভদ্রলোকের মাথার ওপর চাপিয়ে দিল আমেরিকার নিজস্ব লোক, অন্ধ্রের কেশব রাওকে। রহস্যজনকভাবে বোফর্স কেলেঙ্কারির নায়কের সব অপরাধ উবে গেল, পাশ্চাত্যের কাগজগুলো মমতা ব্যানার্জিকে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লেগে পড়ে থাকা একমাত্র লোক বলে তুলে ধরতে থাকে। মমতার পেছনে জমায়েত হল ধর্মীয় নেতারা, দাউদের লোকজন। এক কথাতে ভারতের ওপর রক্তপাতহীন দখল কায়েম করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং সঙ্কটে

পড়া পুঁজিবাদ সার্বিক যুদ্ধ ঘোষণা করল, সন্ত্রাস, ভীতিপ্রদর্শন থেকে শুরু করে টাকা-পয়সার লগ্নি... সত্যিই মনে করিয়ে দিচ্ছিল পোল্যান্ডের কথা, কিংবা, নিকারাগুয়ার কথা। ভারতের মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের নীতি হল, 'বাম হাতে কমিউনিস্টদের সমর্থন কর, ডান হাতে তাদের নিধন কর...' (মাও সে তুং)। কমিউনিস্ট পার্টি যখনই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় ভূমিকা নিয়েছে, নিজেদের ব্যবসার ক্ষতিবৃদ্ধির তত্ত্বটা তাদের সামনে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে।....

একটা সামন্ত বুর্জোয়া রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে ওরা 'বাম'দের ততদিনই ক্ষমতাবিহীন শাসন করতে দিয়েছে, যতদিন বামরা ওদের কাজগুলো করে গেছে... গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে বাজার তৈরি করে দেওয়া, জনগণের ঘাড় ভেঙে রাস্তাঘাট তৈরি করা, যাতে ওরা নিজেদের ভোগ্যপণ্যগুলো গ্রাম থেকে গ্রামে পৌঁছে দিয়ে তাদের পয়সাগুলোও ঘরে তুলতে পারে... অল্পখরচে যাতে মেধা-র সরবরাহ ঠিক থাকে তারা অর্থাৎ প্রয়াত কৃষক নেতা সুলেখক আবদুল্লাহ রসুলের ভাষাতে, 'খুঁটোতে বাধা গরু'র দড়ি যতদূর যাবে, ততদূরই যেতে পারে, তার বাইরে মুখ বাড়াতে গেলেই গোগোলের ঘোড়ার অবস্থা হবে...

একটা ঘোড়া, খুঁটোতে বাধা, খেতে খেতে তার দড়ির সীমানার মধ্যে চারদিকের ঘাস খেয়ে ফেলেছে, সে দেখছে বাইরে সবুজ ঘাস, খুঁটোতে বাধা ঘোড়া। গলা বাড়াতে থাকে, যদি এক খাবলা ঘাস খাওয়া যায়! মাটিতে পেট দিয়ে সে তার শরীরটা টান টান করে ঘাসের কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করে একটু, আর একটু ওদিকে সে যত শরীরটা টান করছে... দড়ির ফাঁস একটু একটু করে গলায় চেপে বসছে। অবশেষে ঘোড়াটি ঘাসের কিনারায় নিয়ে গিয়ে পৌঁছল মুখটা কিন্তু ততক্ষণে গলার ফাঁস চেপে বসেছে...!' পথচারীরা দেখল, টান টান ঘোড়াটি 'মরে পড়ে' আছে, মুখটি ঘাসের কিনারায়। 'আহা রে! ঘোড়াটি খুঁটোটা না উপড়ে সীমা পেরুতে গিয়ে মরে গেল!'

গোগোলের ঘোড়ার মতো বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর সরকার চীন দেখে চমকিত হয়ে ভুলে গেল, আজকের চীন হওয়ার আগে, ১৯৪৯ সালের চীন। দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ করে বাইরের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং ভেতরে প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে পর্যুদস্ত করেই আজকের এগিয়ে যাওয়ার সড়কটা তৈরি করেছে। পুঁজি, নিজের স্বার্থে যে-কাজ করে, সেই কাজগুলো করাটাই 'উন্নয়ন' বলে চিৎকার করে পুঁজির মালিকদের আরও ধনী হওয়ার সড়ক তৈরি করেছে। অবশ্যই এতে কিছু গরিব মধ্যবিত্তের বা অল্পবিত্তদের একটা অংশের কিছুটা সুবিধা হয়। তাদের শ্রেণী-চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে। তাদের মধ্যে লোভ-লালসাগুলো জন্মাতে শুরু করে। প্রাপ্তি-প্রত্যাশার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এরাই

চিৎকার করে 'ব্র্যান্ড বুদ্ধ' বলে, এরা ছাড়া ছাগল, একটা মাঠের ঘাসপাতা শেষ হলে, ধান্দা করে পরের মাঠে ঢুকতে। এই রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে ক্ষমতাবিহীন সরকারে থেকে (আইন, বাহিনী, রাজস্ব সবই কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে) থেকে সব সময় সকলের অর্থনৈতিক প্রত্যাশা (কোনও কোনও ক্ষেত্রে যেটা লালসার পর্যায়ে পৌঁছে যায়) পূরণ করা সম্ভব নয়। পুঁজিবাদের পরিকাঠামো বা সংস্কারের যে-কাজগুলো বিধান রায়, প্রফুল্ল সেনদের করার কথা ছিল, বামফ্রন্টের ঘাড়ে এসে চাপল সেই কাজ। এ কথা তো ঠিকই, জনগণ দায়িত্ব দিলে পালিয়ে আসাটা অন্যায়। সরকারের বাধ্যকতা আছে। কিন্তু পার্টি? পার্টি কেন খুঁটোটা উৎপাটন করে সীমানা অতিক্রমের কথা বলবে না? পার্টির কাজ কোনও সময় সরকার, তা-ও ক্ষমতাবিহীন সরকার বাঁচিয়ে রাখা হতে পারে? অবাক হয়ে ভাবতাম এরা কেন লাল ঝান্ডা ধরে আছে? গণসংগঠনগুলো সরকারের কর্মসূচি রূপায়ণে ব্যস্ত হয়ে গেল। কিন্তু তাদের তো পুঁজি নেই! পুঁজি সৃষ্টি করার ক্ষমতাও নেই। উৎপাদন সম্পর্কটা পাল্টে দেওয়ার হিম্মতও নেই। ফলে কিছু উদ্বৃত্ত জমি বণ্টন, বর্গা, মাইনে বাড়িয়ে কিছু ক্রেতা তৈরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হল। গণসংগঠনগুলো আস্তে আস্তে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। সংগঠন গড়ার থেকে সরকারি কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যাপারে তারা বেশি উৎসাহী হয়ে পড়ে। কারণ শ্রেণী সংগ্রামকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার কর্মসূচি নেই, নীতি নেই, কৌশল নেই। গ্রামাঞ্চলে পরাজিত জোতদার-জমিদার-মহাজন-বদবাবুদের বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রাম, তাদের ফিরে আসার সম্ভাবনাকে চিরদিনের মতো বন্ধ করার জন্য, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক সংগ্রামকে অব্যাহত রাখার কাজে পঞ্চায়েতগুলোকে ব্যবহার না করে, পুরনো কর্তৃত্ব ভেঙে গরিব মধ্য কৃষকের কর্তৃত্ব গড়ে তোলার জন্য ব্যবহার না করে, এক কথাতে, পঞ্চায়েতগুলোকে সোবিয়েত না করে রাষ্ট্রের ন্যূনতম ইউনিট করে তোলা হল (এই রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে!)। ফলে, রহিম শেখ, রাম কৈবর্তরা ভোটে জিতলেও, রাষ্ট্রীয় কাজ (ডি এম, এস পি, রাইটার্সে কথাবার্তা, আইনি কাজ) চালাবেন কী করে? তাঁদের 'ক্যারিশমা' তো ময়দানে, উৎপাদনে, সংগ্রামে! ফলে, পরাজিত সুবিধাভোগী, শোষক পরিবারের ছেলেপুলেরাই কার্যকরভাবে নীতি নির্ধারক হয়ে উঠল, এন জি ও নির্ভরতা গ্রাস করল পঞ্চায়েতকে। ওরা এল পুরনো সমাজের সমস্ত পাঁক এবং পাপ গায়ে মেখেই। দূষিত হলেন রহিম শেখ, রাম কৈবর্তরা। পঞ্চায়েতগুলো হয়ে উঠল, নয়া-কুলাক, নব্য-জমিদার (জমিহীন জমিদার)। গ্রামাঞ্চলে পার্টির বড় একটা অংশের নজর গিয়ে পড়ে 'স্মার্ট' 'মেধাবী' ঝকঝকে ছেলেগুলোকে পার্টিতে আনার, ওরাও রাতারাতি জামা পাল্টে দলে ভিড়ে যায়...। এসব দেখে হাজার দুর্যোগে যাঁরা লাল ঝান্ডা ধরে রেখেছিলেন, তাঁরা হতভম্ব হয়ে সরে যেতে

থাকেন, বিকল্প নেই। বিকল্প মানে পুরনো শোষক-শাসক- লুম্পেন-ডাকাতদের দল। বৃদ্ধি ঘটল বটে তিরিশ লাখ, চল্লিশ লাখ সদস্যের সব সংগঠন, নেতা হওয়ার জন্য পুরনো সমাজ থেকে আসা 'পাপী'গুলো যে ঘরে বসেই, পকেটের টাকা দিয়ে এসব করেছে (যেমন কংগ্রেসে বা অন্য বুর্জোয়া পার্টিতে হয়।) সে-সব ঝাড়াই-বাছাইয়ের পদ্ধতিটা ইতিমধ্যেই অচল হয়ে গেছে। সংখ্যা দেখিয়ে, গোষ্ঠীবাজি করে হয়ে ওঠা ঐতিহ্যবিহীন, এই লোকগুলোই স্থানীয় নেতৃত্বে জাঁকিয়ে বসে লগ্নিটা তুলতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। রিকশা, অটো, ট্যাক্সি ইউনিয়নের নেতাদের একটা অংশ লাইন বিক্রি করে টাকা উসুল করে, লোকে লাল-ঝান্ডা ধরে মিছিল করে, না-হলে ভাতে মরবে। নির্বাচনে অসংখ্য কর্মীও দেখা যায়, ভোট আসে না। পার্টি হারলে কিংবা আর থানা পুলিসের ওপর প্রভাব খাটাতে পারছে না দেখলে নেতারাসুদ্ধু এরা রাতারাতি ঝান্ডাটা খুলে ফেলে বিষ-ফুল ঝান্ডা ওড়ায়... যেমন ডায়মন্ড হারবার লাইনে আমতলাতে চমকে উঠলাম, লোকসভা নির্বাচনের সময় তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে সিটু-র যে অটোরিকশা ইউনিয়ন অফিসে বসে চা খেয়েছিলাম, এই সেদিন ওই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম সেখানে তৃণ-পতাকা ঝুলছে, বোর্ড পাল্টে গেছে! বুঝলাম, বৃদ্ধির সমস্যা। ক্যান্সার বৃদ্ধি। সার্জিকাল কেস। তবুও!

হ্যাঁ, তবুও... থিসিস আছে বলেই না এই অ্যান্টিথিসিসের জন্ম। কায়া আছে বলেই এই ছায়া। তাই দুর্নীতি বিরোধী সংগ্রামের ডাক দিয়ে একেবারে ওপর থেকেই এটা শুরু করতে উদ্যত হয়েছে সি পি এম। ওদেরই একাধিক মন্ত্রী বলতে পারেন, 'কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে ওপর থেকে, ভাঙেও ওপর থেকে, ধ্বংসও হয় ওপর থেকে। নিচের স্তরের দূষণ দূর করতে লাগে ২৪ ঘণ্টা, যদি ওপরের দূষণ মুক্তি ঘটানো যায়!...' পার্টিকে শ্রেণীলাইনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এখনও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাতে বলছি, পচন হয়ত দশ ভাগ, কোথাও কোথাও বিশ, তিরিশ, এটাই বার বার। প্রচারে এসে, এক বাচ্চাকে বার বার দেখিয়ে শিয়াল পণ্ডিতের নটা কুমির বাচ্চা গিলে নেওয়ার মতো, সব গিলছে...। দুধে দু'ফোঁটা চোনার মতো কাজ করছে। এলাকা ধরে ধরে এই সমস্ত ধান্ধাবাজ পুরনো সমাজ থেকে আনা পাঁক গায়ে মাখা লোকগুলিকে জনসমক্ষে সমালোচনা করে বর্জন করা। আইনি-অপরাধ থাকলে, সরাসরি আইনের হাতে তুলে দেওয়া। ত্রিপুরাতে ওদেরই পার্টি যেটা পেয়েছে, এখানে কেন পারবেন না? প্রধান সমস্যা, বিশ্বাসযোগ্যতাটা পুনরায় অর্জন করা এবং সেটা সম্ভব।

'বুদ্ধদেব-সরকার, বিধান-প্রফুল্লদের না-করা কাজগুলো করতে গিয়ে ভুলে গিয়েছিলেন মাও সে তুং। 'তেং' 'তেং' করতে গিয়ে ভুলে গিয়েছিলেন 'মাও'। চীনা

সমাজের শ্রেণী-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, চীনের মাঝারি বুর্জোয়াদের সম্পর্কে বলেছেন, স্বার্থে, দ্বন্দ্বেতে (বিদেশি পুঁজির সঙ্গে) এরা বাম হাতে কমিউনিস্টদের সমর্থন করে; আবার কমিউনিস্ট পার্টি যখন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে সহযোগিতার সংগ্রামে নামে 'এরা ডান হাতে কমিউনিস্ট নিধন করে', কংগ্রেসের এই চরিত্র তো বরাবরের। যে নেহরুকে আমরা কালো কোট পরে মিরাট-ষড়যন্ত্রের আসামি মুজফ্ফর আহমেদ প্রমুখের হয়ে সওয়াল করতে দেখেছি, সেই নেহরুই ৪৮-৫১ সালে চরম নির্মমতার সঙ্গে কমিউনিস্ট নিধনে নেমেছিলেন। (পরিশিষ্টে নেহরু এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি-শ্বেতপত্র) ভারতীয় বুর্জোয়াদের আদর্শ রাজনৈতিক প্রতিনিধি ছিলেন তিনি। বুদ্ধদেবের মস্তিষ্কে স্বপ্নের বিস্তার ঘটিয়ে পুঁজিপতি এবং তাদের প্রতিনিধিরা যে নিধনে নেমেছে এটা নতুন কিছু নয়। ওরা চেয়েছিল সি পি এম ব্রিটিশ লেবার পার্টির মতো সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষাকারী (বিপদে পড়লে) একটা পার্টি হিসেবেই থাকুক ওদের আপত্তি ছিল না। কারণ, ভারতীয় গণতন্ত্র যে টিকে আছে তার কারণ এটা নয় যে, এই গণতন্ত্র আদর্শ গণতান্ত্রিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, ভারতবর্ষে গণতন্ত্র টিকে থাকার রহস্যটা হল, ক্ল্যাসিকাল গণতন্ত্রে যে সমস্ত ব্যক্তি, সংগঠন, দল কিংবা অসামাজিক শক্তি জায়গা পায় না যেমন ডন, টাকা পাচারকারী, এমনকি সাম্রাজ্যবাদ শক্তির কাছে দেশকে বিপন্ন করে দেওয়ার মতো তথ্য, পাচারকারী অথবা তাদের এজেন্সির লোক, সকলকে সেই গণতন্ত্র জায়গা দিতে পারে। এদের জিতিয়ে আনার বন্দোবস্ত করতে পারে। ভাবুন না, ৫৪৩ জন সাংসদের ২৪৫ জনের বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল কেস আছে। অভিযুক্ত, মন্ত্রিসভাতে এক গন্ডা বিদেশি লগ্নি সংস্থার পেনশনভোগী, এক গন্ডা আছে, যাদের চলন-বলন-কথন সন্দেহজনক, কারা তারা? নরসিংহ, কোড়া সকলেই প্রধানমন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী যা-খুশি হতে পারে। দেশের নিরাপত্তা বিক্রি করে ধনপতি বিদেশে কোয়াত্রিচি বেমালুম খালাস হয়ে যেতে পারে। 'কফিন' কেলেঙ্কারি করেও জর্জ ফার্নান্ডেজ জাতীয় নেতা! এক কথাতে 'চোর-ডাকাত-বেইমান-বিশ্বাসঘাতক' এসো এসো সবে! মিলো এক সাথ, এসো হে সাম্রাজ্যবাদ, ধরো হাত! এই ভারতের মহাগণতন্ত্রের সাগর তীরে!

দেশের প্রতিরক্ষাকে সাম্রাজ্যবাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেওয়ার প্রশ্নে, বিশ্ব-পুঁজিবাদকে সঙ্কট থেকে উদ্ধারের জন্য দেশের বহু কষ্টে অর্জিত সম্পদ ওদের হাতে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে মন্ত্রিসভাটাকেই উপড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন প্রকাশ কারাত, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই ... ভারতীয় গণতন্ত্রের সেটা পছন্দ নয়। এরই জন্য তাদের ডানা ছাঁটা হল?

ভোটারদের কথা একটু বলতেই হয়, দিনে তিনশো করে কৃষকের আত্মহত্যার জন্য দায়ী যে দল এবং ব্যক্তিগুলো, বিদর্ভে, মহারাষ্ট্রের চাষীরা ঢেলে তাঁদের ভোট দিলেন। অন্যদিকে কেরলে, যে-দল এবং ব্যক্তিগুলো কেরলে কৃষকদের আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচালেন, তার রাস্তা দেখালেন, তারা পর্যুদস্ত! গণতান্ত্রিক সচেতন জণগণের এ-রকম বিচিত্র ব্যবহার দেখেই বোধহয় '৭২ সালে সি পি আই (এম এল)-এর নামে ইতস্তত পোস্টার পড়েছিল (অবশ্যই পার্টির ছিল না সে-পোস্টার) শুয়োরের বাচ্চা জনগণ, তোমরা করো নির্বাচন/আমরা চললাম বৃন্দাবন। '৭২ সালে যে জনগণকে দিয়ে, যে-রকম ভোট হয়েছিল, তাতে অবশ্য 'জনগণ' (উদ্ধৃতিতে) শব্দের আগে ওই বিশেষণটা ব্যবহার করা খুব বেশি অগণতান্ত্রিক হয়নি।

সংক্ষেপে, ভারতীয় গণতন্ত্রটাই হল খুঁটোতে পোঁতা গরু, বিশ্বপুঁজিবাদ যতটা দড়ি ছাড়ে, ততটাই যেতে পারে। ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধীর আমলে পর্যন্ত দড়িটা একটি লম্বা ছিল, এখন সেটা খাটো হয়েছে। অতীতে কোনও সময়েই ভারতবর্ষ এমন নির্লজ্জভাবে আমেরিকার স্বার্থে এত দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায়নি। প্রধানমন্ত্রীর পদটাই বেসরকারীকরণ হয়ে গেছে। হোয়াইট হাউসের 'সি ই ও'।

লাল-ঝান্ডা উঁচিয়ে বিদ্রোহ করার অপরাধে, প্রকাশরা ঘরে-বাইরে অভিযুক্ত। কয়েকটা সিট কমে গেছে, সত্যিকারের মাও চিন্তাধারার মোতাবেক কাজটাই করেছেন প্রকাশ, (মনে করুন আর না-ই করুন)। তার এই ঝান্ডা উঁচিয়ে ইউ পি এ সরকার থেকে বেরিয়ে আসাটা মনে করিয়ে দেয়, 'রাইট টু রেবেল ইজ জাস্টিফায়েড'।

জনগণের প্রকৃত স্বার্থে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেখে বিদ্রোহ ঘোষণাটাই যুক্তিযুক্ত কাজ!

হার কোথায় বন্যপরাজয়ে? ..

জনগণের মধ্যে গ্রহণযোগ্য করে তাদের যথাসর্বস্ব লুট করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা, তারা এত সমর্থন করতে শুরু করল কেন? আনন্দমার্গী সন্ন্যাসীদের জন্য মাওবাদীদের চোখে জল, মাওবাদীদের সপক্ষে আনন্দমার্গীর সাহায্যের হাত সব ধন্দে ফেলে দিল। সমস্ত সন্দেহ ঘুচিয়ে দেল ভারতের মার্কিন রাষ্ট্রদূত বার্লে আর তাঁর পরামর্শদাতা। চিরকাল সাম্রাজ্যবাদী ঔদ্ধত্য 'সরাসরি আমাকে সমর্থন কর।' না হলে ধরে নেব 'শত্রু'। খুলে গেল গুড়ের ভাঁড় ...বলা যেতে পারে ডান্ডা ফোড় ... টাকা নিয়ে এগিয়ে এল অমর সিংয়ের হাত ধরে দাউদ ইব্রাহিম, টাকাই-টাকা ... লাল হটাও! মানুষের মস্তিষ্ককে দূষিত করার কাজে এসে গেল এতদিন বাম বলে পরিচিত, ঘাপটি মেরে থাকা সাম্রাজ্যবাদী অনুচরেরা। অরওয়েলের নাতি-পুতিরা।

ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল। গ্রামাঞ্চলে ভূমি সংস্কারের নামে উদ্বৃত্ত জমি বণ্টন করে, কিংবা বর্গাদারদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে ভূমিহীন কৃষকদের একটা ভাল অংশকে

জমির মালিক করা হল ... জমির খিদে বাড়িয়ে দেল—বামফ্রন্ট। শ্রেণী-চরিত্রে এই উলম্ফন তাদের মধ্যে লালসা, আরও জমি পাওয়ার খিদে জাগিয়ে ধান্দাবাজ করে তোলে। বিভক্ত হলেই গ্রামীণ সর্বহারা— দ্বন্দ্ব দেখা দিল। অধিকার হিসেবে যে-চাষ করে, জমি তার। ভূমিবণ্টন একটি রণনৈতিক কর্মসূচি, স্ট্র্যাটেজি, যেমন শহরে কলোনিতে পাট্টা। কিন্তু প্রয়োগের সময় নজর রাখতে হবে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করে যাতে এটা। অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গেই যৌথ খামারের আন্দোলন গড়ে তোলা। প্রথম প্রথম জেলাভিত্তিক হবে সেটা। ভূমিবণ্টন থেকে উৎপাদন বণ্টনে উত্তরণ। এটা একটা গণ আন্দোলন। খণ্ড খণ্ড জমিকে অখণ্ড করে যন্ত্র এবং পুঁজির প্রয়োগে অহল্যার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার ঘটানো। কৃষিকে শিল্প হিসেবে গ্রহণ করে পুঁজির প্রয়োগে একদিকে যেমন গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হত। অন্যদিকে, এটাই বৃহৎ শিল্পের ভিত তৈরি করবে। ঘটবে রূপান্তর। জমির রূপান্তর। মানুষের রূপান্তর। চাষা, জমি, গাঁইয়া এই সমস্ত শব্দ অব্যবহারে একেবারে অ্যাকাডেমিক হয়ে ভাষা-ছাত্রদের গবেষণার বস্তুতে পরিণত হবে।

হ্যাঁ, এই ৩৫ বছরই এগুলো করা যেত। উদারীকরণের অন্য পিঠটা মানে বাজারের ফাঁস অর্থাৎ ভোগ্যপণ্য উৎপাদকদের জন্য ক্রেতা তৈরি করতে গিয়ে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক (সাংবিধানিক) বন্ধনের ফাঁসটা আলগা করতে সে যে বাধ্য হয়েছে, সেটা ব্যবহার করেই সংস্কারের মধ্যেই এই কর্মসূচিটা রূপায়ণ করা যেত। খেতগুলো খামার হয়ে যেত।

যৌথ খামারের জন্য আন্দোলনটাই হয়ে উঠত শ্রেণী সংগ্রাম। শ্রেণী সংগ্রাম মানে অর্থনৈতিক সংগ্রাম আর রাজনৈতিক সংগ্রামের যোগফল। এই আন্দোলন হাজার হাজার বছরের সামন্ত উৎপাদন সম্পর্কটা ভেঙে দিয়ে নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলে, গ্রামাঞ্চল থেকে সামন্ত কর্তৃত্ব হুমড়ি খেয়ে পড়ে। নতুন সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়। ধ্বংস হয়। যেহেতু প্রাথমিক লগ্নিকারী হবে রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্ক (যার টাকাগুলো নয়ছয় হচ্ছে) সেই জগৎ এটা ধনবাদী আমেরিকান ব্যক্তি- মালিকানাধীন খামার হত না, আবার যেহেতু এটা বুর্জোয়া সামন্ত রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যে সীমিত ক্ষমতাতে গড়ে ওঠা সেই জন্য চীন বা ১৯২০-র রাশিয়ার কমিউন বা খামার হত না। বিকশিত হত এই দুটোর মাঝামাঝি একটা স্তর হয়ে, ব্যক্তি মালিকানাধীন থেকে উন্নত যৌথ মালিকানাধীন যার ঝোঁক সামাজিক মালিকানাধীনের দিকে এমন একটি সংস্থা।

রাজ্য প্ল্যানিং কমিশনের কাউকে কাউকে বিস্তারিতভাবে বলেওছি, 'হামবাগে' ভর্তি একটি সংস্থা! না-বোঝে অর্থনীতি, না জানে রাজনীতি, কেবল মডেল খোঁজে। চীনের কমিউনগুলোর ব্যর্থতা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য এদের মুখস্থ। আমেরিকার সি

আই এ-র দপ্তর থেকে প্রকাশিত ছোট খবরগুলোও এদের নখদর্পণে। জানে না, মরিসডাব, রবিনসন বা স্তালিনের অর্থনৈতিক তত্ত্ব। জানে না কমিউনের সফলতা কোথায়? উন্নয়ন মানে বোঝে সংখ্যতত্ত্ব। থাক, মডেল খোঁজা নয়। মডেল তৈরি করার সাহস নেই। শ্রদ্ধেয় অজিত বসু বিকল্পে গ্রামস্বরাজের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলের ব'কলমে সামন্ত ব্যবস্থাটাকে চিরস্থায়ী করা। (যে-তত্ত্বে এন জি ও এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোও বিশ্বাসী)।

পরিবর্তন তো হয়েইছে। সামাজিক ঘটনাবলি মানে একটা প্রক্রিয়া। প্রসেস বা প্রক্রিয়া মানে-গতি-পরিবর্তন-বিকাশ এবং রূপান্তর। '৭৭-এর পর তো জনজীবন স্তব্ধ হয়ে যায়নি। '৭৮ পঞ্চায়েত পরিবর্তনের সূচনা, জোতদার-জমিদার কর্তৃত্বের পশ্চাদাপসরণ বা গর্তে ঢোকা বা জামা পাল্টানো। পরিবর্তন উদ্বৃত্ত জমিগুলোকে চাষের জন্য তুলে দেওয়া তো পরিবর্তন— গ্রামীণ উৎপাদন বৃদ্ধি— বাজার সৃষ্টি— পরিবর্তন মানে একে সরিয়ে ওকে বসানো নয়। সামাজিক প্রক্রিয়ার ধারাবাহিক বিকাশের একটা বিবর্তনমূলক অগ্রগতি— এরই ফল বিকাশ বা উন্নয়ন। যে গ্রামে বিদ্যুৎ ছিল না, বিদ্যুৎ এল...।

## তৃতীয় পর্ব

### পরিবর্তন? না, চাই রূপান্তর

বিশ্ব পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র, পুঁজিবাদটাই যখন গাড্ডায় পড়েছে, বাঁচার জন্য বিশ্বের সম্পদগুলোকে ব্যবহার করতে উদ্যত, সেই সময় তার গণতন্ত্রও মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। অতীতে যুদ্ধ করেই তারা এই সমস্যার সমাধান করে নিত। পুঁজিবাদীদের এই সঙ্কটের সুযোগ নিতে পারব যে মেহনতী শ্রেণী তারা অসংগঠিত, এই সুযোগটা বিধ্বস্ত বিকৃত গণতন্ত্রই গ্রহণ করে, প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করেই বিশ্বপুঁজিবাদ গণতান্ত্রিক উপায়েই দেশগুলো দখল করে। সঠিক শক্তির অভাবে বিকৃত অনেক শক্তিরই জন্ম হয়। বাম স্লোগানের আড়ালে কার্যত তারা ডান কাজগুলোই করে। রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদের জন্ম হয়। জনগণের মৌলিক সমস্যা সমাধানে সার্বিক ব্যর্থ কংগ্রেস-বি জে পি জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি করে। অতীতে এ রকম সময়ে সীমান্ত যুদ্ধ করে বাঁচতে চেষ্টা করেছে। সঙ্কটে পড়া পুঁজিবাদকে বাঁচানোর জন্যই যেন তথাকথিত মাওবাদের জন্ম। সত্যিকারের মাও-চিন্তার অনুসারী হলে তাদের প্রধান কর্তব্য হত, এসো ঐক্যবদ্ধ হও! তোমাদের লাল ঝান্ডা ধরে থাকার অধিকার প্রমাণ কর। পুঁজিবাদকে ধাক্কা দাও! সেই শক্তির রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি, ... তোমরা লড়ো তোমাদের কায়দায়, আমাদের লড়তে দাও

আমাদের মতো করে। শত্রু এক, বিশ্ব পুঁজিবাদ! এই ঐক্য গড়ে তোলার উদ্যোগ তো সেই দলেরই নেওয়ার কথা, যারা সশস্ত্র সংগ্রাম করছে বলে দাবি করে। মাওয়ের এরকম একটা আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়েই না চিয়াং কাই শেকের দুই জেনারেল তাকে কার্যত বন্দী করে মাওয়ের সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য করেছিলেন। ওঁরা যদি আন্তরিকভাবে এই আহ্বানে জানাতেন এবং সততার সঙ্গে কার্যকর করতে উদ্যত হতেন, আমি একশো ভাগ নিশ্চিত সি পি আই (এম), সি পি আই (এম এল)-এর নেতারা না চাইলেও ( ?) ব্যাপক কর্মী, সমর্থক ওঁদের আহ্বানে সাড়া দিতেন। বিপরীতে তাঁরা যেটা করছেন, পশ্চিমবঙ্গে শ্রেণী বিশ্লেষণে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল অংশের প্রতিনিধিত্বকারী শক্তিকে রাজনৈতিক জমি পুনরুদ্ধারে সাহায্য করে চলেছেন। হিটলারের ব্ল্যাকশার্ট আত্মজীবনীতে সে যেটা বলেছে, 'সন্ত্রাস ভয়' চালিয়ে যাও, মানুষজনকে ঘরে ঢুকিয়ে দাও, নির্বাচনে জেতা নিশ্চিত। তথাকথিত মাওবাদীদের মঞ্চে আগমন। সন্দেহ হল, হঠাৎ বহুজাতিক এবং লুম্পেন পুঁজি নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমগুলো এদের প্রচারে এমন ব্যস্ত হয়ে গেল কেন ? এন জি ও, যাদের মূল কাজ, সাম্রাজ্যবাদকে তথ্য সরবরাহ করা। আগে যেখানে একজন স্নাতক ছিলেন, সেখানে প্রতিটি (প্রায়) গ্রামে দু'চারজন এম এ পাস ছেলে-মেয়ে, যেখানে সপ্তাহে একদিন 'ভাগা দিয়ে' মাংস ফেরি হত, সেখানে ২-৪টা মাংসের দোকানে গোটা গরু-ছাগল বিক্রি হওয়ার জন্য ঝুলছে, আদিবাসী তরুণীটিও দোকানে গিয়ে লিরিল, লাক্স খোঁজে। সার্ফ খোঁজে। কাপড় কাচার সোডা বাংলা গোলা জায়গা নিয়েছে জানবাজারে, বড়বাজারে, ভেজাল দেওয়ার উপাদান হিসাবে মারোয়াড়ি খদ্দের ধরার জন্য। ধারাবাহিকতার পরিমাণগত বিকাশ বা উন্নয়ন... এখানেই থেমে গেল বামফ্রন্ট। উন্নয়নের ইষ্টমন্ত্র জপেই মগ্ন! উলম্ফনে ভীত। চলতে চলতে থমকে গেল! সামাজিক গতি তো থেমে থাকবে না। ফলে ঊর্ধ্বমুখী রেখচিত্র অধোমুখী হতে শুরু করে। সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীলদের পুনরুত্থান শুরু হয়। প্রয়োজন ছিল রূপান্তরের স্লোগান সামনে রেখে ধারাবাহিকতাতে ছেদ... এক ধাপ উপরে উঠে আবার নতুন স্তরে শুরু করা।

চাই রূপান্তর, কী মানুষের, কী সমাজের! দালালি করি এই স্বপ্নেরই। চাষা থাকবে না, গাঁইয়া থাকবে না, হবেন কৃষি-মজুর, কৃষি-বিজ্ঞানী, কৃষি-বিশারদ, তখন গ্রামগুলোতে সুবিধা নেই অজুহাতে কোনও ডাক্তারই আর সমাজবিরোধীদের মতো বলবে না 'যাব না'! মন্ত্রী নয়, চাই অভিভাবক।

চাই রূপান্তর।

গোপন কথাটি রাখিব না আর গোপনে

হ্যাঁ, ভাই যখন, সমগ্র ভারতবর্ষের রূপান্তরের স্বপ্ন নিয়ে সক্রিয় ছিলাম, বিবর্তনে

বিশ্বাসী দলগুলোর নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, জানতাম পঞ্চায়েতরাজের তাত্ত্বিক (অর্থনীতিবিদ)-কে, অমর্ত্য সেন মাথায় থাকুন, উনিই ছিলেন সত্যিকারের প্রায়োগিক অর্থনীতির সঠিক তাত্ত্বিক। তিনি যেদিন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত পদ্ধতিটি প্রমোদবাবুকে দেন কথিত আছে, বলেছিলেন, প্রমোদ আপনার হাতে এই দু-মুখো তলোয়ারটা তুলে দিলাম। সঠিক প্রয়োগ হলে শ্রেণীশত্রু নির্মূল হবে, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দোরগোড়াতে পৌঁছে যাবেন। সাবধান! ভুল প্রয়োগে কিন্তু আপনারাই নির্মূল হয়ে যাবেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকদের নেতৃত্বে মধ্য চাষীকে দলে টেনে, ধনী চাষীকে নিষ্ক্রিয় করে, গ্রামাঞ্চল থেকে জোতদার-জমিদার-মহাজনদের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক (ধর্মভিত্তিক) কর্তৃত্বের খতম অভিযান শুরু হবে। গড়ে উঠবে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তর কর্তৃত্ব। অর্থাৎ পঞ্চায়েতগুলো হবে সোবিয়েত। কৃষকসভা হবে তার মূল স্তম্ভ। তার রক্ত সংবাহী তন্ত্রী, পঞ্চায়েতগুলোকে এই রাষ্ট্রব্যবস্থার নিম্নতম ইউনিট করতে গিয়ে দূষণ ঘটল। পঞ্চায়েতগুলো রাষ্ট্রীয় ভাইরাসের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেল। বেশিরভাগ না হলেও বেশ বড় অংশে সেগুলো নব্য কুলাক বা নব্য জমিদার হয়ে ওঠে। বিচ্ছিন্নতা কী পরিমাণে বোঝা যায় কালনার সেই কৃষকটি কথা থেকে, তৃণমূল প্রার্থীকে ভোট দিয়ে এসে যিনি ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে চিৎকার করে ওঠেন। সাত দিনের জন্য হলেও ওই প্রধানকে টেনে নামাব। মাটির রাস্তাতে হাঁটাব। বোঝাব, আমরা কেমন আছি! ও ভুলে গেছে! সাতদিন পরে আবার আনব। বাইকের ধোঁয়া উড়িয়ে জমিদারের মতো তুই তোকারি করার বিরুদ্ধে। চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খেতে প্রস্তুত! ফাঁকে ঢুকছে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। ভুল প্রয়োগে গলা কাটছে। লাল ঝান্ডা আর ভোট সমর্থক হয়ে গেছে ওদের কাছে। ভোটে শাস্তি দিতে গিয়ে (অন্যপথ বন্ধ) লাল ঝান্ডাটিই ফেলে দিয়েছে। কে ওঁকে বলবে বন্ধু। ট্রেনে যেমন দু-চারজন চোর পকেটমার থাকে, এই যাত্রাপথে সেরকম দু-চারজন পাবে, তাকে ধরো। শাস্তি দাও। বর্জন করো। ঝান্ডা, পার্টি তোমার পাশে আছে। ঝান্ডাটি ফেলো না বন্ধু। হ্যাঁ, যোগাযোগ ছিল রসুল সাহেবের সঙ্গেও, এই সেদিন পর্যন্ত। খেদ করে উনি বলতেন, 'আমরা ক্রমশ খুঁটোয় বাঁধা গরু হয়ে পড়ছি (কথাটি আমি ব্যবহার করে প্রায়শই)। দড়ি যতদূর যাবে আমরাও ততদূর! তোমরা যারা খুঁটোটা উপড়েছ, লাল ঝান্ডার ভবিষ্যৎ তোমাদের হাতে। ঝান্ডাটা বাঁচিয়ে রেখ।

যোগাযোগ রাখতাম দ্বন্দ্বে-ঐক্যে বিনয়দা (চৌধুরি) আর তার আগে বিজয় পালের সঙ্গেও।

দালালি করেছি, বর্তমানে মাওবাদী হয়ে যাওয়া জনযুদ্ধ পার্টিরও। তখন তাঁরা কানাই চ্যাটার্জির 'সমরবাদী' লাইনের কাছে (চারু মজুমদার বিরোধী, নকশালবাড়ির

কৃষক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা মহান অভ্যুত্থান বিরোধী বিকল্প লাইনের প্রবক্তা এবং চারু মজুমদার সেটিকে 'সমরবাদ' বলে চিহ্নিত করে, বলেছেন দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদ এবং জঙ্গি অর্থনীতিবাদ, যা শেষ বিচারে গেরিলা এবং জনগণকে চারিত্রিকভাবে অধঃপতিত করে) কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। পার্টিকে বিলুপ্ত করেননি। আমিই বোধহয় পশ্চিমবাংলাতে প্রথম কলমবাজ যে জনযুদ্ধের মহান কাজগুলোর সপক্ষে ঢাক পিটিয়েছি। সেগুলি আমার এক পুস্তকেও আছে। (এই দেনা, এই গণতন্ত্র, দে'জ প্রকাশনী)। যার আকর্ষণে গদর, ভারবারা রাও, আরও অনেকে ছুটে এসেছেন আমার ঘরে। তাঁরা তখন গ্রামাঞ্চলে যৌথখামার গড়ছেন। জোতদারের জমি বাজেয়াপ্ত করে বণ্টন করেই। সার সরবরাহ পদ্ধতি গড়ে তুলছেন, বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বিকল্প প্ল্যান্টও গড়ছেন। সমগ্র অস্ত্র ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁদের পেছনে, তেলেঙ্গানার কৃষক, রায়লসীমা কৃষক ঐক্যবদ্ধ। অন্ধ্রের কুলি, তেলেঙ্গানার দিনমজুর একই সভাতে রায়ত-কুলি সংযমে। সেটা ছিল মাও চিন্তার প্রয়োগ। রাজনীতি কমান্ড করত বন্দুককে। তারপর ওঁরা মাওবাদী হয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করলেন বুর্জোয়া দ্বন্দ্ব কাজে লাগানোর নামে শত্রুর শত্রু আমার মিত্র' মাও নির্দেশিত শ্রেণী লাইন ভুলে গেলেন। মাওবাদী হয়ে বাদ দিয়ে দিলেন মাও সে তুং-কে। লাতিন আমেরিকার ভার্সানকে মৌলিক নীতি করলেন, টাকা, অস্ত্র, লুম্পেনশক্তি (মার্কোসবাদী তত্ত্ব) জড়ো করে জনগণকে বন্দুকের ডগাতে ঐক্যবদ্ধ করার রণনীতি। খেলতে লাগলেন প্রতিক্রিয়ার হাতে। চন্দ্রশেখর রেড্ডিকে সরিয়ে রাজশেখর রেড্ডিকে আনলেন। রাজশেখর প্রথমেই পুকুরে ফলিডল দিল।

মাছগুলো ভেসে উঠল। ওঁরা বললেন 'অন্ধ্র লাইন'। গ্রামাঞ্চল থেকে হাজার হাজার বছরের কর্তৃত্ব ভাঙার যে সংগ্রামগুলো জটিল পথে কিন্তু নির্দিষ্ট লক্ষ্যে চলছিল স্তিমিত হতে হতে থেমে গেল। বন্দুকের জোরে সহজ বিজয়ের রাস্তাতে নামলেন। চীন বিপ্লবে যেমন একদল রোডিং (ভ্রাম্যমাণ) বা ভবঘুরে বিপ্লবীর সৃষ্টি হয়েছিল সে রকম একটা শক্তি রাজনীতিকে গ্রাস করল। মাও সে তুং এদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত, রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করেন। শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী ফৌজকে এদের সংগ্রামের হাত থেকে রক্ষার জন্য এদের নেতাকে কোর্ট মার্শালও করতে বাধ্য হন। মৌলিক কাজগুলো স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাপক গ্রামঞ্চল থেকে ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। রাজশেখর রেড্ডি এই সময়টার জন্যই অপেক্ষা করছিল। ঝাঁপিয়ে পড়ল নিধন যজ্ঞে। জেলে আটকরাও রেহাই পেলেন না। ধরা পড়া স্থানীয় নেতা এবং কর্মীদের বার করে এনে খুন করে এলাকায় তাঁদের মৃতদেহগুলো ফেলে রেখে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে থাকে। অন্ধ্রথেকে প্রায় নির্মূল হয়ে গেল 'জনযুদ্ধ'। এখন আর একটা ভুলের পথে।

‘পৃথক তেলেঙ্গানা’র পেছনে বলে প্রচার। থাক। এ ব্যর্থতার দায় তো আমারও। এত দিন সংগ্রামের পরেও ‘শত্রু-মিত্র’ চিনতে না পারার ব্যর্থতা। অন্ধ্রের থেকে কোনও শিক্ষা না নিয়েই পশ্চিমবঙ্গে সামাজিকভাবে সব চেয়ে পচে যাওয়া প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মদতকারী হিসেবে ওদের আবির্ভাব ঘটেছে। প্রথম দিকে কেন্দ্র ওদের বাড়তে দিয়েছে। আরও ঝাড়খণ্ড সরকার ওদের নীরব সমর্থক (!)। ভারতীয় প্রতিক্রিয়া ‘শত্রুকে পাঠিয়েছে বাঘ মারতে’। মাওবাদীরা নেমেছে সি পি এম নিধনে, তার শক্তি কমানোর কাজে...।

অক্লান্ত লাল ঝান্ডা। জ্বলছে লাল ঝান্ডা, ভূমিহীন কৃষকের লাশ পচছে... জিতছে অধিকারীরা। সুফিয়ানরা। গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পের টাকা তোলা হিসেবে ওরা পৌঁছে দিচ্ছে অস্ত্র কেনার জন্য। যাতে ২০১১-তে মমতা জেতেন। জিতলে মমতা কী করবেন? ‘লেনিনের মূর্তিটি ভেঙে তার এক টুকরো আলিমুদ্দিনে পাঠিয়ে দেব, সাজিয়ে রাখার জন্য!’ উনি জাপান ফুটবল টিমের বিরোধী কারণ তাদের জার্সির রঙ লাল, লিকার ‘চা’ খান না, লাল বলে। কিষেণজি ভাবছেন, মমতা এলে উনি বাংলার অধীশ্বর হয়ে পুতুলের মতো মমতাকে নাচাতে পারবেন! সোচ্চারে বলেওছেন সেই কথা। এক পয়েন্ট কর্মসূচি, সি পি এম মারো। মাও কোথায়? এ তো হিটলার! একটা ‘হিটলার’-এর আগমনের হাত থেকে জনগণকে বাঁচানোর দালালি কি ওদের ‘গণ-আদালতে’ (অভিযোগকারী স্বয়ং যেখানে বিচারক) সোপার্দ্য যোগ্য অপরাধ! দালালি যেহেতু করে যাচ্ছি তাই শেষ হতে পারে না। বিরতি। ছুটতে হবে সেখানে, যেখানে একটা আড়াই মাসের বাচ্চা-সহ ছ’জন মহিলাকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন ওঁরা! পুলিস, যৌথবাহিনী কার্যত ওদের হাতে অস্ত্র সরবরাহের জন্যই আছে। দালালি তো করতেই হবে। ওই দুধের শিশুটির জন্য...।

# পরিশিষ্ট —১

# নেহরুর চোখে
# ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

শ্বেতপত্র ১৯৪৯

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ প্রচারিত

বিষয়সূচি

১। সরকার এবং কমিউনিস্টরা
২। হিংসার প্রচারক কমিউনিস্টরা
৩। কমিউনিস্ট হিংস্রতার কিছু নমুনা
৪। জনগণের প্রতিরোধ
৫। সিদ্ধান্ত
৬। প্রতিবেদন

# প্রথম অধ্যায়

## সরকার এবং কমিউনিস্টরা

১৯৪৯ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি বিধিবদ্ধ আইনসভায় বিবৃতি প্রদানকালে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নিম্নলিখিত বক্তব্যটি রাখেন:

'বিগত বছর থেকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' ভারত সরকারের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে সেটা কেবলমাত্র খোলাখুলি শত্রুতাই নয়, বরং তাকে সরাসরি বিদ্রোহের সূচনা হিসেবেই বর্ণনা করা যায়। তাদের নীতি হল কতগুলি বাছাই করা এলাকায় এমন সব কার্যকলাপ শুরু করা, যার পরিণতি সশস্ত্র বিদ্রোহে; মানুষজনকে খুন করতে উৎসাহিত করা, লুটতরাজ করা, এবং অন্তর্ঘাত চালান। এই সভা এবং মাননীয় সদস্যবৃন্দ খুব ভালভাবেই জানেন বিদ্রোহের জন্য কমিউনিস্টরা এমন সব এলাকা বেছে নিয়েছেন, সেগুলি বিদেশের সঙ্গে আমাদের সীমান্তবর্তী অঞ্চল।

তাদের এই একই নীতির কার্যকরী রূপ হিসেবে তারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণকে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহে উস্কানি দিচ্ছে। সৌভাগ্যের বিষয়, তাদের এই প্রচেষ্টা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিশালী ইচ্ছার দ্বারা প্রতিহত হয়েছে। এবং এর ফলেই সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছে। যা-ই হোক না কেন, ভারতবর্ষের কিছু কিছু অংশে তারা অশেষ দুর্দশা নামিয়ে এনেছে; সীমাহীন ক্ষতিসাধন করেছে।

এই সভা খুব ভালভাবেই অবগত আছেন যে বিগত কয়েক বছর ধরে নানান ধরনের দুর্দশাগ্রস্ত লোকেদের জন্য আমরা বিভিন্ন রকমের অর্থনৈতিক সমস্যায় আগে থেকেই ব্যতিব্যস্ত। এই সময় এটা না বললেও বোঝা যায়, দেশের সমস্ত প্রান্তে দ্রুত পণ্যসামগ্রী সরবরাহ আমাদের কর্মসূচি।

গতবছরের নভেম্বরের শেষে 'সারা ভারত রেলওয়ে-মেনস ফেডারেশন'-এর কার্যকরী কমিটি নাগপুরের এক সভায় তার সঙ্গে যুক্ত ইউনিয়নগুলিকে ধর্মঘট করার নির্দেশ দেন। এই সময়েই আমাদের কাছে নিশ্চিতভাবে খবর আসতে থাকে যে, রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের মধ্যে কার্যকলাপরত কমিউনিস্টরা সাধারণভাবে ডাকা এই ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত থেকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির আপ্রাণ চেষ্টা করবে, বিশেষ করে তারা হিংস্রতা আর অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ দিয়ে বিশেষ ফয়দা তোলার চেষ্টা করবে।

তখন আমার সহকর্মী পরিবহণ মন্ত্রীর সঙ্গে রেলওয়ে মেনস ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের আলোচনার সিদ্ধান্ত হয়। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল

এই সম্ভাব্য ধর্মঘট বন্ধ করা। কারণ সরকার জানত দেশের এই সঙ্কটকালীন মুহূর্তে রেল ধর্মঘট দেশের বুকে এক বিপর্যয় ডেকে আনবে। কারণ এই সময় রেল ধর্মঘট মানে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষতিই নয়, যখন গুজরাট এবং কচ্ছে দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীতে হাজার হাজার মানুষ এবং গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তখন পরিবহণ ব্যবস্থার গন্ডগোল এবং বিচ্ছিন্নতা একেবারেই অসহ্য। এই আলোচনাসভা চলে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে এবং আমরা কতকগুলি বিষয়ে একমত হই। এর ফলেই রেলওয়ে মেনস ফেডারেশন ধর্মঘট না করার সিদ্ধান্ত নেয়।

এত কিছু সত্ত্বেও ফেডারেশনের মধ্যে কর্মরত কমিউনিস্টরা কিন্তু ধর্মঘটের সিদ্ধান্তে অটল থাকে এবং তাদের কর্মসূচি কার্যকরী করার পদক্ষেপ নেয়। এ ব্যাপারে সরকারের কাছে বিশ্বস্ত সূত্রে নিয়মিত রিপোর্ট আসতে থাকে।

সরকার খবর পায় কমিউনিস্টরা ব্যাপক হিংসার সাহায্যে আসন্ন ধর্মঘটকে সংগঠিত করবেই। বস্তুতপক্ষে এ ধরনের অন্তর্ঘাত তখন ঘটতে শুরু করেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সম্প্রতি ছাত্র-জনতা এবং জনগণের অন্যান্য কিছু অংশের সঙ্গে কলকাতায় পুলিসের একটা সঙ্ঘর্ষের ঘটনাও ঘটে গেছে। এই সঙ্ঘর্ষের সময় পুলিস এবং জনগণের সম্পত্তি লক্ষ্য করে 'হ্যান্ড গ্রেনেড' এবং 'বোমা' ছোঁড়া হয়। আমাদের হাতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে, যার ওপর ভিত্তি করে আমি বলতে পারি যে-চক্র কলকাতার এই সঙ্ঘর্ষে ছাত্রদের হাতে 'হ্যান্ড গ্রেনেড' এবং 'বোমা' তুলে দিয়েছিল, তারাই আসন্ন রেল ধর্মঘটেও ছাত্রদের একইরকমভাবে ব্যবহার করবে।

ভারতের কমিউনিস্ট ইদানীংকালে জাতির সব থেকে বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে রেল ধর্মঘটের মতো হরতাল সংগঠিত করার দিকে নিজেদের কাজকর্ম কেন্দ্রীভূত করেছে। এই যে সমস্ত ধর্মঘট, এগুলিকে শ্রমিকদের অবস্থা ভাল করার জন্য বা তাদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে ট্রেড ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গিতে ডাকা অর্থনৈতিক আন্দোলন বলে চিহ্নিত করা যায় না। তাঁরা এগুলিকে দেশের মধ্যে এক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টির হাতিয়ার হিসাবেই ব্যবহার করতে চায়। অবশ্যই নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে তারা তা করছে, সে উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন!

খুবই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদ্ধতিতে এরা রেল ধর্মঘটের মাধ্যমে সমগ্র রেল ব্যবস্থাটাকে অচল করে দিয়ে দেশের মধ্যে দুর্ভিক্ষের অবস্থা করতে চায়। এতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছতে পারবে না। ফলে দেশব্যাপী দেখা দেবে এক চরম বিশৃঙ্খলা। প্রশাসন ভেঙে পড়বে, এর ফলে শুরু হবে গণঅভ্যুত্থান। নামী-দামি কমিউনিস্ট নেতাদের একটা বড় অংশ ইতিমধ্যেই আত্মগোপন করেছেন। সরকারের

কাছে গাদা গাদা এমন সব তথ্য আছে যার দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, অন্তর্ঘাতের একটা সুসংগঠিত প্রয়াস চলছে। বিশেষ করে রেলওয়ে ব্যবস্থায়। এর চিরাচরিত পদ্ধতি হল— ক্ষতি সাধন করা। ইঞ্জিন-ব্যবস্থা, লাইন উপড়ে ফেলা, এবং গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যের গুদামগুলি ধ্বংস করা। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ এবং বৈদ্যুতিক কেন্দ্রগুলিও এদের লক্ষ্যবস্তু। মাননীয় সদস্যবৃন্দ। স্মরণ করুন, এই কিছুদিন আগে কলকাতার টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এরা কীভাবে ক্ষতিসাধন করেছে।

আমাদের সৌভাগ্য, রেলওয়ে কর্মচারীদের ব্যাপক অংশ এবং শ্রমিকশ্রেণী এই ধরনের ধর্মঘটের এবং এই পথের বিরোধিতা করেছেন। অন্যদিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কী করছে? জিদ ধরে তারা ব্যাপক শ্রমিকদের ইচ্ছাকে নস্যাৎ করছে। সঙ্গে সঙ্গে, যাঁরা তাদের সঙ্গে একমত হতে পারছেন না, তাঁদের আতঙ্কিত করে তোলার পদ গ্রহণ করেছে।

অদ্ভুত ব্যাপার! এরা নিজেরা অন্যের কাজের স্বাধীনতাকে খর্ব করছে, আবার দাবি তুলছে— ওদের (এই সমস্ত) সমাজবিরোধী-গুন্ডামিগুলি সংঘটিত করার স্বাধীনতা দিতে হবে। যখনই এই সমস্ত গুন্ডামির বিরুদ্ধে কোনও সরকারি হস্তক্ষেপ হয়, তখনই নাগরিক-অধিকার খর্ব করা হচ্ছে এই অজুহাতে বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদ জানানো হয়। ওদের নাগরিক অধিকার রক্ষা করার দাবি আসলে জঘন্য সমাজবিরোধী কাজ করার অবাধ স্বাধীনতার দাবি, এটা ওদের কৌশলেরই অঙ্গ।

সরকার জনগণের নাগরিক অধিকার রক্ষা করার জন্য সর্বদা ব্যগ্র, তারা চায় নাগরিকদের অধিকারগুলি সুরক্ষিত থাকুক। কিন্তু 'জাতির বিরুদ্ধে সাধারণভাবে সন্ত্রাসমূলক কাজ, কিংবা তাদের ওপর জোরজুলুম চলতে দেওয়াটাই কি নাগরিক অধিকার? সরকার এরকম ধারণায় বিশ্বাস করে না।' এইরকম সন্ত্রাসমূলক সহিংস কাজের বিরুদ্ধে জনগণকে নিরাপত্তা দেওয়াটা সরকারের পবিত্র কর্তব্য। যদি এই রকম সন্ত্রাস এবং হিংসা চলতে দেওয়া হয়,... কোনও সরকার বা কোনও সামাজিক জীবনই সেখানে অসম্ভব। এ রকম অবস্থা সহ্য করা যায় না। সুতরাং সরকার এই রকম অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য।

যদি রেল শ্রমিকদের একাংশ ধর্মঘট করবেন বলে ঠিকই করে থাকেন, দৃঢ়তার সঙ্গে তার মোকাবিলা করা হবে।

এই সন্ধিক্ষণ সময়ে, এটা মনে রাখতে হবে, এ ধরনের ধর্মঘট কোনও মতেই সাধারণ ট্রেড ইউনিয়নের বা তার সমপর্যায়ের কাজ নয়।

সরকার শ্রমিক-কর্মচারী ও অন্য অংশের কর্মচারীদের আইনি দাবিগুলির প্রতি সহানুভূতিশীল এবং সেগুলি মেটানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হচ্ছে। সরকার তার

কর্মচারীদের যে কোনও সমস্যার মোকাবিলা করতে এবং সেগুলি দূর করতে প্রস্তুত। কিন্তু কোনও মতেই কোনও চক্রের সহিংস হুমকি কিংবা কার্যকর সশস্ত্র বিদ্রোহের কাছে মাথা নিচু করতে সরকার রাজি নয়।

এই কারণে, ওদের এই নীতির জন্যই, কমিউনিস্ট পার্টির বেশ কিছু সভ্যকে সরকার গ্রেপ্তার করেছে। তাদের জন্য যা নির্ধারিত এবং অনিবার্য বরাদ্দ সেইরকম অনেক নিবর্তনমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে সরকার বাধ্য হয়েছে। সমস্ত প্রাদেশিক সরকারকেও এই ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। যাতে জরুরি প্রতিষ্ঠানগুলি কমিউনিস্টদের অন্তর্ঘাতের হাত থেকে রক্ষা পায়। সরকার মনে করে তার এই কাজের পেছনে নিঃসন্দেহে সমগ্র দেশের এবং এই সভার সমর্থন আছে, এটাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, আর এ পদ্ধতি সহিংস-পন্থার বিরোধী।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ব্যাপক এবং বিস্তৃতভাবে সহিংস-পথের প্রচার চালাচ্ছে এবং পরিকল্পনা করছে, তারা সমস্ত আচরণবিধি, সমস্ত শিষ্টতা বোধ বিসর্জন দিয়ে মহান জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা দেখিয়েছে এবং এখনও দেখিয়ে চলেছে। মানুষের জীবনের প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবোধ নেই। *

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে পাঠকেরা দেখবেন, কী রকম জঘন্য, ডাহা-মিথ্যা কথা বলে চলেছে তারা। কেমনভাবে সরল, সাদাসিধে মানুষগুলিকে তারা ভুল পথে চালিত করছে— উত্তেজিত করছে।

এইরকমভাবে মিথ্যা আর অতিরঞ্জনের ওপর ভিত গেড়েই তারা আইনের শাসনকে উপেক্ষা করে চলেছে। উদ্দেশ্য সমগ্র দেশব্যাপী একটা বিশৃঙ্খলা এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি করা।

* এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয় পরবর্তীকালে ৪৯-এর অভিযুক্তরা অর্থাৎ নেহরুদের বিরুদ্ধে এই বিষোদ্গার করেছিলেন, তাঁরাই নকশালদের বিরুদ্ধে ঠিক একই ভাষা হুবহু একইভাবে বলে চলেছেন।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## হিংসার প্রচারক কমিউনিস্টরা

আচমকা আক্রমণের জন্য ব্রিগেড

'ভারতের কমিউনিস্টরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সরকারের সশস্ত্র বাহিনীকে আক্রমণ করার জন্য এবং তাদের পরাজিত করার উদ্দেশ্যে তারা নিজেদের লোকদের বিস্তারিতভাবে গেরিলাদল ও শক ব্রিগেড তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সর্বত্র নির্দেশ দিয়েছে। তাদের পুস্তিকা 'কর্মীদের এবং শক ব্রিগেডের জন্য পাঠক্রম' থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলি তুলে দেওয়া হল;

'শক ব্রিগেডের ক্যাডারদের প্রশিক্ষণের পাঠক্রম'/ভূমিকা—

১) 'এই পাঠক্রম শক ব্রিগেড ক্যাডারদের জন্যই কেবলমাত্র নির্ধারিত,

আরও দুটো পাঠক্রম আছে, একটা হল 'ব্রিগেডের কমান্ডারদের জন্য'। অন্যটা হল 'জেলা অথবা আঞ্চলিক কমান্ডারদের জন্য'।

২) 'এই পাঠক্রম মাও নির্ধারিত গেরিলানীতি এবং কৌশলের ওপর ভিত্তি করেই তৈরি করা হয়েছে'—

এই অধ্যায়ে নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে শক ব্রিগেডের কর্মীরা কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে এবং তার সমাধান কী করে করতে হয় সেগুলিও দেখানো হয়েছে।

এই পুস্তিকার ভূমিকা খুবই সংক্ষিপ্ত। তাতে শুধু দেখানো হয়েছে 'কে শত্রু? কেন আমাদের হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হয়েছে?' আর বলা হয়েছে 'সংগ্রামের দীর্ঘস্থায়ী চরিত্র এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির কথা।'

ক্যাডারদের উদ্যোগ বাড়ানোর জন্য সাংগঠনিক অংশে বলা হয়েছে: 'এই পাঠক্রম তিন দিনের মাত্র। অর্ধেক সময় তত্ত্বগত শিক্ষার জন্য, অর্ধেক সময় প্রয়োগের জন্য।' প্রত্যেকটা প্রয়োগভিত্তিক প্রশিক্ষণের সময় তাদের গোপনে খুন করার পদ্ধতি অন্তত দুদিন শিক্ষা দেওয়া হয়। এর মধ্যে নিশাচর বৃত্তিও আয়ত্ত করতে হয় তাদের।

দুটি দিন তারা দু'দলে ভাগ হয়ে একদল 'সরকারি বাহিনীর' ভূমিকায় এবং অন্য দল 'নিজেদের সুরক্ষিত রেখে' পুলিস, থানা আক্রমণকারীর ভূমিকায় এই ট্রেনিং নেয়।

দিন এবং রাত সব সময় ক্যামোফ্লেজ (শত্রুকে ধোঁকা দেওয়া) পদ্ধতি, ক্রলিং (কনুইয়ে ভর দিয়ে চলা) পদ্ধতিগুলিও তারা এ সময় শেখে। এই যে বাস্তব দৈনন্দিন পরিশ্রম এবং প্রশিক্ষণ, এতে কর্মীদের প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

(৩) ‘যাঁরা প্রশিক্ষণ দেবেন তাঁরা যেন কখনই সমস্ত কর্মীকে সব কিছুর ট্রেনিং না দেন, কারণ কলকাতার কর্মীদের জঙ্গলের লড়াইয়ের ট্রেনিং দেওয়ার কোনও মানেই হয় না। কিংবা দার্জিলিংয়ের কর্মীদের নদীপথে শত্রুকে আক্রমণ করার ট্রেনিং দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাই বা কী? যাদের অঞ্চলে যে সমস্যা, সেই সমস্যাগুলির দিকে নজর রেখে সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দেওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। তা না হলে পাঠক্রম অত্যন্ত বেশি হয়ে যাবে। বাহুল্যের পরিমাণ বাড়বে।’

(৫) ‘যে সব অস্ত্র ব্যবহার করা হয়— তাদের মধ্যে রাইফেল, শটগান, হাত বোমা-ই প্রধান, কারণ এগুলি জোগাড় করার জন্য বেশি প্রচেষ্টা চালাতে হয় না। টমিগান, স্টেনগান, রিভলভার এ সব উচ্চ স্তরের পাঠক্রম।’

এই পুস্তিকার দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম ‘সংগঠন’।

‘গেরিলা কার্যকলাপ বলতে কী বোঝায়’—

এই শিরোনামে এখানে বলা আছে,

‘গেরিলা কার্যকলাপ বলতে আমরা বুঝি (আচমকা) থানা আক্রমণ, জমিদার, জোতদারদের ওপর আক্রমণ চালানো। ওত পেতে বসে থেকে আগুয়ান পুলিস দলকে ধ্বংস করা, খতম করা এবং তাদের কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া। শত্রুর যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অন্তর্ঘাত করে নষ্ট করা এবং এই উদ্দেশ্যে টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ছিন্ন করা, টেলিগ্রাফ লাইন উপড়ে দেওয়া, যাতে শত্রু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারপর আচমকা পশ্চাদ্‌ভাগ থেকে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া, যার ফলে তারা হতভম্ভ হয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে না। দুর্বল জায়গা বাছা, যাতে ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করতে তাদের সময় লাগে। এই উপরে তাদের ধ্বংস সাধন করা। শেষে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সশস্ত্র কার্যকলাপ চালানোর মতো স্বাধীন এলাকা গড়ে তোলা। ‘ছোট থেকে শুরু কর, আস্তে আস্তে নিজস্ব শক্তি বৃদ্ধি কর’—চীনের এই যুদ্ধ কৌশল আপাতত এখানে চলবে না।’ ভেবে দেখুন! শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করার শক্তি অর্জন করতে তাদের কী দীর্ঘ সময় লেগেছে!’

### রাজনৈতিক উদ্দেশ্য

‘এর প্রধান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হল দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনগুলির বিকাশ সাধন করা, সেগুলিকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করা। তখন সমগ্র জনতা সাধারণভাবে এক বিশাল অভ্যুত্থানে জেগে উঠবেন এবং হাতে অস্ত্র তুলে নেবেন।’

### ব্রিগেড গঠন

‘প্রাথমিক গেরিলা ইউনিট বা আমরা যেটাকে ‘শক-ব্রিগেড’ বলছি, সেটা হবে তাদের নেতা সমেত পাঁচ থেকে দশ জনের। আক্রমণের ধরন এবং চরিত্রটা মাথায়

রেখে নিজেদের অস্ত্র শক্তির কথা ভেবে সব থেকে ভাল 'শক ব্রিগেডে'র সদস্য সংখ্যা (নেতা-সহ) দশের মধ্যে রাখা গেলে।'

'যদি কোথাও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং দ্রুত জমায়েত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনও স্থানিক সমস্যা থাকে, দলের সদস্য সংখ্যা পাঁচ থেকে দশ, যে কোনও সংখ্যা হতে বাধা নেই।'

'...যে কোনও একটি গ্রাম থেকেও এই লোকেদের নেওয়া যেতে পারে অথবা দুই বা ততোধিক গ্রাম থেকেও। প্রথম দিকে ব্রিগেডের কমান্ডার, জেলার পার্টি সম্পাদকের সঙ্গে আলোচনা করে জেলার নেতৃবৃন্দের দ্বারা নিয়োজিত ব্যক্তিই হবেন।'

'এখন ব্রিগেডগুলিকে লোকাল কমিটিগুলির নেতৃত্বেই কাজ করতে হবে। এমন একটা সময় আসতে পারে যখন গ্রামে কিংবা ছোট একটা অঞ্চলে একাধিক ইউনিট গড়ে উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে ইউনিটগুলির যোগাযোগ রক্ষা করেই কাজ করা উচিত।'

## অস্ত্র

'কর্মীদের কোনও বিশেষ ব্যাজ বা ইউনিফর্ম থাকা উচিত নয়। কারণ এর ফলে শত্রুরা তাদের চিহ্নিত করার সুযোগ পাবে। প্রত্যেকের কাছে একটা খুক্‌রি (ভোজালি জাতীয় অস্ত্র) টাঙ্গি অথবা ছোট দা রাখতে হবে। ছোট ছুরি এবং শক্ত দড়ি কাছে রাখা উচিত, কারণ প্রয়োজনে নিজেদের ব্যবহারে লাগাতে পারবেন; নিজেদের আসল (প্রধান) অস্ত্রের সঙ্গে অতিরিক্ত হিসাবে এগুলি রাখতেই হবে। জমায়েত হওয়ার সময়, 'অ্যাকশনে'র সময় এগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য।'

তিন নম্বর অধ্যায়ে 'শক ব্রিগেডের কর্তব্য' বর্ণনা করা হয়েছে:

'শক ব্রিগেডের কর্মী হিসাবে আপনাদের দায়িত্ব হল আক্রমণ করা, ধ্বংসের উদ্দেশ্য মাথায় রেখে শত্রুর পথে ওত পেতে থাকা এবং সেই সমস্ত জায়গায় অন্তর্ঘাত চালানো, যেখানে শত্রু জমায়েত হতে পারে। এগুলিই আপনাদের আপাতত কাজ। ব্রিগেড কমান্ডারের নেতৃত্বে এই সব কাজ করতে হবে।

## হানা

'রেইড' বা হানা কথাটির মানে হল অবস্থানরত অচল শত্রুর ওপর ছোটখাটো আক্রমণ। নির্দিষ্ট লক্ষ্য মাথায় রেখেই এই দ্রুত নিষ্পত্তিমূলক আক্রমণ।

একটি 'হানা' সংগঠিত করতে গেলে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির দিকে ব্যতিক্রমহীনভাবে অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে এবং পালন করতে হবে। এই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি (তথ্য) সংগ্রহ করা শক ব্রিগেড কমান্ডারের দায়িত্ব।

অস্ত্র 'হানা'র জ্ঞাতব্য...

(১) বস্তুর এলাকা এবং অবস্থান;

(২) শত্রুর শক্তি (মানুষ এবং বস্তুগত);

(৩) যাওয়ার রাস্তা এবং উপায়; পরে ফিরে আসার পথ (যে- পথে শত্রুর অবস্থানের দিকে পৌঁছানো হবে, কমান্ডা লক্ষ্য রাখবেন যেন ফেরা পথ তার থেকে ভিন্ন হয়);

(৪) শত্রুকে হতচকিত করে দেওয়ার জন্য, তাদের হিসেবের বাইরে যে সময়, (হানার জন্য) সেই সময় বেছে নেওয়া, যে পথে তারা আক্রমণ আশঙ্কা করতেই পারে না সেই পথ নির্ধারণ করা;

(৫) নিজেদের শক্তি (সংখ্যা এবং অস্ত্রশস্ত্র);

(৬) শত্রুর শক্তি বৃদ্ধির পথ বিচ্ছিন্ন করা (নতুন শত্রু যাতে সে পথে এসে শত্রুর শক্তি বৃদ্ধি না ঘটাতে পারে); পরিকল্পনার সময় যখন শত্রুকে হতচকিত করে দিতে হয়, তখন একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায় তাকে পাকড়াও করার নীতি গ্রহণ করা, এবং শত্রুর চেয়ে সংখ্যায় বেশি লোক জমায়েত করার নীতি অবলম্বন করা; যেখানে শত্রুকে 'হকচকিয়ে' দেওয়ার সম্ভাবনাটা ভাল এবং বিশাল গুরুত্বপূর্ণ, অথচ শত্রুর সংখ্যার চেয়ে বেশি লোক জমায়েত করা সম্ভব নয়, যেখানে 'হানাদার' বাহিনীর সংখ্যা কম হলেও চলবে। সে সব ক্ষেত্রে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে।

'হানা'র লক্ষ্যবস্তু

গ্রামের দিকে বর্তমান 'শক ব্রিগেড' নিম্নবর্ণিত বস্তুগুলির ওপরই আক্রমণটা নিবন্ধ রাখবেন:— (১) থানা, (২) পুলিস ফাঁড়ি বা ক্যাম্প, (৩) জমিদার, জোতদারদের বাড়ি, (৪) রেল স্টেশন।'

তাহলে লোঝা যাচ্ছে (ওই সমস্ত উদ্ধৃতি থেকে—অনুবাদক) কমিউনিস্টদের 'হানার' পরিকল্পনা কী এবং কীভাবে সেগুলি ওরা করবে।

এরপরে সংক্ষেপে কীভাবে থানা এবং অন্যান্য লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করতে হবে তার নির্দেশ।

পশ্চিমবঙ্গ

যদিও কমিউনিস্টরা তাদের এই নীতির এবং কার্যপদ্ধতি সারা ভারতবর্ষব্যাপী প্রচারের চেষ্টা করেছে তথাপি তাদের কাজের মূল কেন্দ্র হল পশ্চিমবঙ্গ এবং হায়দরাবাদ

(বর্তমানের অন্ধ্রপ্রদেশ—অনুবাদক)। তাদের এই অহিংস কার্যকলাপ যে ইচ্ছা-প্রণোদিত ব্যাপার, এটা শুধু ওপরে উল্লিখিত উদ্ধৃতি থেকেই ফুটে ওঠে না, তাদের প্রচারিত সার্কুলারগুলি থেকে এটা আরও বেশি পরিস্ফুট যে, যেগুলি পরিকল্পনামাফিক দৃঢ়-প্রত্যয়জাত। (সার্কুলার, প্রচারপত্র এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকা থেকে) এটা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় কমিউনিস্টরা বিভিন্ন সময়ে, তাদের কর্মী, দরদি এবং জনগণের মধ্যে এগুলি প্রচার করছে।

১৯৪৯ সালের ৯ই মার্চ নির্ধারিত রেল ধর্মঘটের ব্যর্থতা তাদের ওপর একটা প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। এই প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য দলিল নং ৩/৪৯ (বোম্বাই থেকে প্রচারিত — এপ্রিল ৯, '৪৯)-এ কমিউনিস্ট পার্টি বলেছে—

'৯ই মার্চের ধর্মঘট যেভাবে হওয়ার কথা ছিল, যদি সেইরকমভাবে বিকাশলাভ করত, যদি রেল শ্রমিকরা নিজেদের প্রচণ্ড শক্তি এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হতেন, তাহলে সর্বশক্তি নিয়োগ করে নেহরু সরকার তাঁদের ওপর যে বর্বর নিপীড়ন নামিয়ে এনেছে, তাঁরা সেটার মুখের মতো জবাব দিতে পারতেন, 'সমাজতন্ত্রী-বেইমান'গুলিরও সাহস হতো না— তাঁদের পিছন থেকে ছুরি মারার...'

'৯ই মার্চের নিপীড়ন শ্রমিকশ্রেণীর কাছে আর একটা শিক্ষা বয়ে এনেছে; সেটা হল—'যদি তোমরা তোমাদের দাবি আদায়ের সংগ্রামে জয়লাভ করতে চাও তাহলে নিপীড়নকে প্রত্যাঘাত করে পরাজিত করার জন্য, বেইমানির মোকাবিলা করার জন্য, তোমাদের অবশ্যই একটা ইস্পাত দৃঢ় বিপ্লবী সংগঠনে সংগঠিত হতে হবে— এমন একটা সংগঠন, ব্যাপক গ্রেপ্তারেও যাকে নতিস্বীকার করানো যায় না, এমনকি রাইফেল আর বুলেট দিয়েও তাকে আতঙ্কিত করা যায় না। তা হলেই, এবং কেবলমাত্র তখনই, শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করতে পারে, সংগ্রামগুলিকেও রক্ষা করতে পারে এবং বিজয়ের দিকে যেতে পারে...।' এই সার্কুলার অনুযায়ী কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা প্রাদেশিক কমিটি, ১৯৪৯ সালের ২৬শে এপ্রিল একটা সার্কুলার প্রচার করে, তাতে 'সমস্ত পার্টি কর্মীদের', 'জনগণের মেজাজকে তুঙ্গে তোলার চেষ্টা' হিসাবে 'সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই' করার শপথ গ্রহণ করা হয়েছে, তারা এমনকি পুলিস ও সেনাবাহিনীর প্রতিও আহ্বান জানিয়েছে। এর উদাহরণ হচ্ছে এই সময়ের একটা বাংলা প্রচার-পত্র যার শিরোনাম: 'সিপাহী ভাইসব! তোমাদের বন্দুকে আর বেয়নেট মন্ত্রী এবং অফিসারদের দিকে ঘুরিয়ে দাও।' এতে বলা হয়েছে...'নেহরু সরকারের নির্দেশ কার্যকরী করতে অস্বীকার কর... কারণ আর কতদিন তোমরা, টাটা-বিড়লা-নলিনী-বিধানের সরকারের হয়ে তোমার মা-বোন, তোমার ভাই শ্রমিক-কৃষকদের জবাই করতে থাকবে? তোমাদের হাতে বন্দুক এবং বেয়নেট ঘুরিয়ে ধর। নারীঘাতী,

শিশুঘাতী, ফ্যাসিস্ট কংগ্রেসিদের ওপর সেগুলি চালাও! ঘৃণিত অফিসারদের গ্রেপ্তার কর। কলকারখানায় বিপ্লবী শ্রমিক আর সস্তার বিপ্লবী ছাত্রদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলো। কারাগারগুলির দরজা খুলে দাও। যে সব বন্দীরা আজ অনশনে মৃত্যু-পথযাত্রী তাদের মুক্ত করো।'

১৯৪৯ সালের ৮ই জুন, একটি পুলিসবাহিনী বেঙ্গল-পটারি এলাকায় একটা গন্ডগোল থামাতে গেলে কমিউনিস্ট কর্মীরা তাদের মারাত্মকভাবে আক্রমণ করে। এরপর আরও শ্রমিক সেখানে উপস্থিত হলে শ্রমিকরা কারখানা দখল করে নেয়। ইট, লোহার রড, অ্যাসিড বাল্ব প্রভৃতি দিয়ে পুলিসকে প্রতিহত করে। একজন ডেপুটি কমিশনার, একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, দুজন সাব-ইনস্পেক্টর এবং অনেক পুলিস কর্মচারী আহত হয়। অবশেষে কারখানা অঞ্চলকে মুক্ত করার জন্য পুলিসকে গুলি চালাতে হয়। ঠিক একইরকমভাবে হাওড়ার মেসার্স অ্যালানবেরি কারখানাটি কমিউনিস্টরা বেশ কয়েকদিন দখল করে রাখে। শেষ পর্যন্ত একটা বিশাল পুলিসবাহিনী শ্রমিকদের হাত থেকে কারখানাটা মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর হয়ে সেখানে পৌঁছলে, তারা কারখানা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ওই প্রতিষ্ঠানেরই টালিগঞ্জ ডিপোর ঘটনার প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনা করছি (তৃতীয় অধ্যায় দেখুন)।

জুন মাসে ২২ তারিখ ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্বে শ্রীরামপুরে মাহেশের রথতলাতে একটা শ্রমিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে কমিউনিস্টকর্মীরা বলপূর্বক মিলগুলি দখল করে নেওয়ার জন্য শ্রমিকদের উত্তেজিত করে। পুলিসের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে, সেই অস্ত্র তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হয়। এই সভার শেষে কমিউনিস্টরা শ্রীরামপুর অভিমুখে একটা মিছিল বার করে। মিছিল হঠাৎ মাঝপথে তিনভাগ হয়ে যায়। একই সঙ্গে এই তিনটি দল তিনটি আক্রমণস্থল বেছে নিয়ে আক্রমণ করে, একটা দল মাহেশ পুলিস থানা, অন্য একটা দল আই এন টি ইউ সি অফিস এবং তৃতীয় দলটি শ্রীরামপুর সাব-জেল আক্রমণ করে। প্রায় ২৫০ জন লোক পুলিস ফাঁড়ি আক্রমণ করে, কিন্তু যেই পুলিসবাহিনী এসে উপস্থিত হয় আক্রমণকারীরা চেয়ার টেবিল এবং অন্যান্য আসবাবপত্র ভাঙচুর করে সরে পড়ে। শ্রমিক সংগঠনের অফিসটাকে দ্বিতীয় দল আগুন ধরিয়ে দেয়। তৃতীয় দলটা জেলের পাঁচিলের গায়ে অ্যাসিড বাল্ব এবং বোমা ছোঁড়ে, কিন্তু যেই জেলের পাগলা ঘণ্টা বেজে উঠল এবং জেল সিপাহিরা প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে এল, গুন্ডাগুলি চম্পট দেয়।

অবশ্য এই ঘটনাগুলিই কমিউনিস্টদের প্রচারপত্রে অতিরঞ্জিত হল। আবার সার্কুলার দিয়ে প্রচার করাও হল। নিদর্শন হিসাবে আমরা ওদেরই প্রচারিত 'বিপ্লবী জনগণের প্রতি কমিউনিস্টদের আহ্বান' নামটা একটা প্রচারপত্রের অংশবিশেষ তুলে দিলাম...'

‘পটারির শ্রমিকরা যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের সূচনা করেছেন সেই পথে অগ্রসর হন। খুনে বিধানের গুলি চালাবার প্রতিবাদে প্রত্যেকটা কারখানায় ধর্মঘট সংগঠিত করুন। পুঁজিবাদীদের ভাড়াটে গুন্ডাবাহিনীর দ্বারা সংগঠিত এই বিধান-সরকারকে ধ্বংস করুন। সমস্ত কারখানার শ্রমিক ভাই সব। আপনার ভাই ‘বেঙ্গল পটারির’ শ্রমিকরা যে রাস্তা দেখিয়েছেন সেই পথে এগিয়ে চলুন। পটারি শ্রমিকদের রক্তের বদলা নিন। প্রত্যেকটা কারখানায় ধর্মঘট সংগঠিত করুন। সশস্ত্র মিছিল নিয়ে কংগ্রেসি নেতা এবং মন্ত্রীদের আক্রমণ করুন। কংগ্রেস সেবাদল এবং পুলিসের সঙ্গে লড়াই করুন।

(এই প্রচারপত্রটা মনে হচ্ছে নেহরুর গোয়েন্দা দপ্তরের বানানো; কারণ, (১) এই কোথাও জোগাড় করতে পারলাম না। (২) ভাষা একেবারে পুলিসি। — লেখক)

জেলের ভেতরের বন্দীদের ঘটনাগুলি কমিউনিস্টদের অস্ত্রাগার (প্রচারের — অনুবাদক) ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাস থেকেই আরও একটা নতুন অস্ত্র যোগ করেছে। তারা মনে করছে দেশের শান্তিভঙ্গ করার এবং জনগণের সমবেদনা আদায় করার এটা (জেল বিদ্রোহ— অনুবাদক) একটা কার্যকরী উপায়। এরই জন্য তারা জেলে জেলে কমিউনিস্ট এবং কয়েদি ‘ডোটিনিউ’দের আক্রমণ করতে উৎসাহিত করছে। জেলের ভিতরে কমিউনিস্ট কয়েদি এবং ‘ডেটিনিউ’দের আচরণবিধির সংবিধান অনুসরণ করে উত্তরপ্রদেশ প্রাদেশিক কমিটি কর্তৃক প্রচারিত ‘বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে রাজ্য কমিটির মূল্যায়ন’ নামক প্রচারপত্রে বলা হয়েছে —

‘এই সময় কমরেডদের বাইরে (জামিনে— লেখক) বেরিয়ে আসা উচিত নয়। বরং জেলের মধ্যেই সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা অবশ্য কর্তব্য।’

গত ২১শে এপ্রিল পশ্চিমবাংলায় সাড়ে তিনশো বন্দী অনশন করতে শুরু করবে। সঙ্গে সঙ্গেই ‘মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি’ নামে কমিউনিস্ট প্রভাবিত একটা গণসংগঠনের প্রচারপত্র বিলি করা হয়। তার শিরোনাম—

‘৬০০ রাজবন্দীর জীবনরক্ষার জন্য বিশাল অভ্যুত্থান সংগঠিত করো।’ সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের কাছে এই আবেদনপত্রে বলা হয়েছে — ‘ছাত্র-শ্রমিক মধ্যবিত্ত নাগরিকগণ, বিশেষ করে মহিলারা এগিয়ে আসুন। আসুন আমরা দেশব্যাপী একটা বিপ্লব ঘটাই— যার দ্বারা পুঁজিবাদী এই সরকারের ভিতটাই নাড়িয়ে দেওয়া যাবে।...’

অনশনরত বন্দীদের ওপর অকথ্য নিপীড়নের অভিযোগের একটা ধারাবাহিক প্রচার চালানো হয়। কোনও সন্দেহই নেই কমিউনিস্টদের এই অভিযোগগুলি ডাহা মিথ্যা কথা। যা-ই হোক না কেন সরকার পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় দৃঢ়ভাবে তাদের মোকাবিলা করতে বদ্ধপরিকর। কোথাও কোথাও সরকার অনশনরত

বন্দীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছে। তাদের কিছু কিছু দাবি মেনেও নেওয়া হয়েছে। আসল কথা হল, দাবিগুলি অজুহাত মাত্র। জেলের মধ্যে এবং বাইরে সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটিত করার উদ্দেশ্যেই তারা এই পথ গ্রহণ করেছে। জেলের বন্দীদের দাবিগুলির সমর্থনে তারা বিভিন্ন জায়গায় অনেক সভা এবং মিছিল সংগঠিত করছে।

এবং ইতিমধ্যে গত ২৭ এপ্রিল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে দুটি স্থানে তারা খুব উদ্বেগ এবং বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' একটা হলে জমায়েত হয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত করে। তারপর তারা একটি মিছিল বার করে। যেহেতু মিছিল ১৪৪ ধারার এলাকা দিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে চলেছিল, তাই পুলিস তাদের গতি রোধ করে। তখন পুলিসের গাড়ি লক্ষ্য করে কয়েকটি বোমা ছোঁড়া হয় এবং কিছু পুলিস কর্মী আহত হয়। ফলে আত্মরক্ষার্থে পুলিসকে কিছু গুলি চালাতে হয়। এই ঘটনায় মোট ৮ জন নিহত হয়। ২৭শে ৬ জন, ২৮শে ১ জন। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে বলা হয়েছে, এদের মধ্যে ৫ জনের মৃত্যু বোমার আঘাতে, ১ জনের মাত্র গুলিতে এবং বাকি ২ জনের মৃত্যু বোমা এবং গুলি দুটোতেই। ৫ জন পুলিস কর্মচারী বোমার টুকরোতে আঘাত পান। সরকারি বাস এবং ট্রামও ওদের আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায়নি। ২৭ তারিখের ঘটনার জের ২৮ তারিখেও চলে। পুলিস গাড়ি এবং পুলিস দল লক্ষ্য করে অনেক বেশি পরিমাণ বোমা ছোঁড়া হতে থাকে। এর ফলে একাধিক পুলিস নিহত হন। কয়েকটি ক্ষেত্রে পুলিস গুলি চালাতে বাধ্য হয়। কিন্তু কোনও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। ৩০ তারিখের মধ্যে সব কিছু শান্ত হয়ে যায়। ২৭ তারিখের নিহতদের মধ্যে ৫ জন ছিলেন মহিলা।

আবার ছ'সপ্তাহ পর জুন মাসের ৮ তারিখে প্রেসিডেন্সি জেলে নিরাপত্তা আইনে ধৃত আটক বন্দীরা তাদের প্রাতঃকালীন ক্রিয়াকর্ম সারার পর হঠাৎ ঘোষণা করে কমিউনিস্টদের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে তাঁরা লকআপে ঢুকবেন না। বিপথে চালিত তাঁদের এই অন্যায় আবদার পরিত্যাগ করানোর জন্য দফায় দফায় তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে সারা দিন ধরে আলোচনা হতে থাকে। অনেকরকমভাবে তাঁদের বোঝানো হয়। সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে ঠিক হয়, যদি কমিউনিস্টরা নির্ধারিত সময় রাত্রি ৯টার পরেও লকআপে না ঢোকেন, তা হলে তাঁদের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করা হবে।

সেই মতো সন্ধেবেলা জেল কর্মচারীরা প্রথমে তাঁদের অনুরোধ করেন, পরে হুমকিতেও যখন কাজ হয় না, তখন বাইরের সশস্ত্র পুলিসের সাহায্য চাওয়া হয়। কমিউনিস্ট বন্দীরা সমস্ত আসবাবপত্র জ্বালিয়ে দিয়ে এবং খাটিয়া ইত্যাদির সাহায্যে ব্যারিকেড তৈরি করে। প্রথমে একদল পুলিস জেলে ঢোকে এবং তারাও বন্দীদের বোঝানোর চেষ্টা করে। এই দলটাকে গালাগালি করা হয় এবং সশস্ত্রভাবে আক্রমণ

করা হয়। তখন পুলিস লাঠি চালায়। যখন পুলিসরা তাদের তালা বন্ধ করানোর জন্য ওয়ার্ডের মধ্যে ঢোকানোর চেষ্টা করছিল তখন নানান বস্তু ছুঁড়ে তাদের আক্রমণ করা হয়। এরকম অবস্থায় 'লকআপ' করানোর জন্য নিরাপত্তার খাতিরে গুলি চালানো ছাড়া আর উপায় ছিল না। এই ঘটনায় একজন ডি সি, একজন এ সি এবং ৩৫ জন পুলিস কর্মী আঘাত পান। নিরাপত্তা আইনে ধৃত একজন বন্দী পরে হাসপাতালে মারা যান এবং ১২ জন আহত হন।

দমদম জেলের কমিউনিস্ট বন্দীরা ১০ জুন জানান যে, যেহেতু তাঁদের কিছু দাবির প্রতি সরকার কর্ণপাত করছেন না, সেই কারণে তাঁরা অনশন করবেন। প্রেসিডেন্সি জেলের ঘটনার কথা শুনে তাঁরাও নির্ধারিত সময়ে, 'লকআপ' হতে অস্বীকার করেন। এ ক্ষেত্রেও প্রেসিডেন্সি জেলের মতোই ঘটনা ঘটল। যখন সমস্ত শান্তিপূর্ণ উপায় এবং সদিচ্ছার জবাব গালাগালি আর ইট-পাটকেল দিয়ে দেওয়া হতে লাগল, তখন তাঁদের জেলে ঢোকানোর জন্য পুলিসকে বাধ্য হয়ে গুলি চালাতে হল।

এই 'অপারেশন' ভোর তিনটে পর্যন্ত চলে। শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট বন্দীরা নিজেরাই আত্মসমর্পণ করেন। জেল কর্তৃপক্ষও তাঁদের সেলে বন্দী করতে সক্ষম হন। ঘটনার পর দেখা গেল, নিরাপত্তা আইনে ধৃত ৩ জন মরে পড়ে আছেন। ৩২ জন গুরুতর আহত। অন্য দিকে ৯ জন পুলিস এবং ৩ জন জেল ওয়ার্ডারও আহত হয়। এটাই হল অনশন, বন্দী নির্যাতন, 'বন্দীহত্যা' সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য।

এই সোজা সদ্য ঘটনাগুলিকেই কমিউনিস্টরা কেমনভাবে বিকৃত করেছে, সেটা তাদের প্রচারিত প্রচারপত্র সার্কুলার ইত্যাদির ভাষা থেকেই বোঝা যায়:

'রাজনৈতিক বন্দীদের সমর্থনে (রাজবন্দী দিবস হিসাবে ঘোষিত) ২৭শে জুন সমগ্র বাংলায় আগুন জ্বালাও' এই শিরোনামে প্রচারিত এক প্রচারপত্রে বলা হয়েছে:

'খুনি বিধান সরকারকে রাজবন্দীদের দাবিগুলি মেনে নিতে বাধ্য করুন। শ্রীরামপুর ও দক্ষিণ কলকাতার পথে এগিয়ে চলুন! এই সমস্ত বীর যে পথ দেখালেন তাকে অনুসরণ করুন! এই পথে পশ্চিম বাংলার প্রত্যেকটা গ্রামে, গঞ্জে, শহরে এই খুনি সরকারকে বিড়ম্বিত করে তুলুন। বর্বর নৃশংস কংগ্রেসিদের প্রতি কোনও দয়ামায়া দেখানো নয়। এরা তিলে তিলে বন্দীদের হত্যা করছে। তাদের প্রতি দয়া দেখানোর অর্থ, বন্দী হত্যাকে সমর্থন করা। শ্রমিক, কৃষক এবং বাংলার সাধারণ মানুষ! বিরাট অভ্যুত্থানে ফেটে পড়ুন। সমগ্র দেশ ধর্মঘট আর মিছিলে ভরিয়ে দিন। কংগ্রেসি খুনিদের স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য আই এন টি ইউ সি অফিস এবং কংগ্রেস সেবাদলের ওপর আক্রমণ সংগঠিত করুন। জেল গেট আক্রমণ করে বন্দীদের ছিনিয়ে আনুন!

এ আই টি ইউ সি এবং কৃষক সভা আগামী ২০শে জুন 'বন্দী দিবস' পালনের

ডাক দিয়েছে। ওই দিন সমগ্র বাংলাদেশে আগুন জ্বালান। চারদিক দিয়ে এই বর্বর কংগ্রেসিদের আক্রমণ করুন! বিভিন্ন জায়গায়, তাদের বুঝতে না দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ আক্রমণ সংগঠিত করুন! আতঙ্কে এই সরকার থর-থর করে কাঁপছে। কত জায়গায় তারা পুলিস পাঠাবে?

আজ এই ২৭শে জুন শপথ নিন। আজ থেকেই শপথ নিন... আজ থেকেই এগিয়ে চলার দিন। অত্যাচারী সরকারের সাধের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিন। রাজনৈতিক বন্দীদের দাবিগুলি মেনে নিতে সরকারকে বাধ্য করুন।

দাবি তুলুন... 'রাজবন্দীদের মুক্তি দাও! খুনি, অত্যাচারী মন্ত্রিসভা এবং দালালদের শাস্তি দাও!'

বাংলায় প্রচারিত আর একটি প্রচারপত্র 'এই খুনের বদলা নাও।' তাতে বলা হয়েছে:

'কলকাতার বীর শ্রমিক, ছাত্র, নাগরিক এবং মা-বোনেরা! আজ ৯ দিন হতে চলল খুনি কংগ্রেস সরকারের কারাগারে রাজবন্দীরা অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, তথাপি তাঁরা এই ফ্যাসিস্ট খুনি সরকারের কাছে মাথা নত করতে রাজি নন। বন্দীদের জীবন নিয়ে রায় মন্ত্রিসভার এই ছিনিমিনি খেলা আমরা আর বরদাস্ত করব না। কলকাতার বিপ্লবী মা-বোনেরা ২৭শে এপ্রিল রাস্তায় নেমে অত্যাচারী সরকারের হাত থেকে বন্দীদের বাঁচানোর জন্য তাঁদের দাবিগুলি সরকারকে মেনে নেওয়ার আওয়াজ তোলেন! সঙ্গে সঙ্গেই এই কংগ্রেস সরকার গুলি চালিয়ে ৪ জন মহিলা এবং ২ জন নাগরিককে হত্যা করেছে। ফলে কলকাতার বীর জনগণের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

তাঁরা হাতের কাছে যা পেয়েছেন তাই নিয়ে কংগ্রেস সেবাদলের গুন্ডা এবং পুলিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এইরকমভাবে কলকাতার ছাত্র এবং নাগরিকগণ এই অত্যাচারের বদলা নিতে শুরু করেছেন। জনগণের এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রতিরোধের মুখে পড়ে রায় মন্ত্রিসভা ক্ষ্যাপা কুত্তার মতো ব্যবহার শুরু করেছে।...

গোটা বউবাজার কলেজ স্ট্রিট এলাকা তারা হাজার হাজার পুলিস দিয়ে ঘিরে তৈরি করেছে।' প্রচণ্ড উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ভাষায় এতে এই বলে শেষ করা হয়েছে—

'শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র এবং জনগণ! সমগ্র বাংলা জুড়ে এই খুনের বদলা নিন। খুনিদের খুঁজে ফাঁসিতে লটকান। এই মন্ত্রিসভা ধ্বংস করুন।' হত্যাকারীদের বাঁচার কোনও অধিকার নেই। জনগণের উচিত তাদের টুকরো টুকরো করে ফেলা। বিধান-নলিনী-দত্ত-মজুমদার এবং তার সহযোগীদের যেখানেই দেখবেন আক্রমণ করুন। শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র এবং জনগণ। এই খুনিদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করুন। ধর্মঘট ও

মিছিল সংগঠিত করে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কংগ্রেসি নেতাদের মারাত্মকভাবে আক্রমণ করুন। কালোবাজারিদের ঘাঁটি কংগ্রেসি অফিসগুলিতে আগুন ধরিয়ে দিন। মন্ত্রীদের বাড়িগুলি আক্রমণ করে তছনছ করে দিন।

রক্ত ঝরিয়ে রক্তহীনতায় মুমূর্ষু আপনার বন্দীভাইদের ছিনিয়ে আনুন। আপনার কর্মস্থল যেখানেই হোক না কেন, আপনার পেশা যা-ই হোক না কেন, কাজ ছেড়ে বেরিয়ে আসুন। সভা, শোভাযাত্রা করুন। এই খুনিদের আক্রমণ করুন বীর শহিদদের দৃঢ় মনোবল এবং রক্তের স্মৃতি আপনাদের সাহস এবং উদ্দীপনা দিক। মৃত্যুকে অস্বীকার করে খুনিদের শাস্তি দিন।' এই প্রসঙ্গে 'নিরাপত্তা আইনে ধৃত বন্দীদের হত্যার বদলা চাই। মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে বন্দীদের ছিনিয়ে আনুন' নামক আরও একটা সচিত্র প্রচারপুস্তিকার শেষে বলা হয়েছে...

'জনগণ! খুনিদের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসুন। খুনিদের দ্বার থেকে বন্দীদের মুক্ত করুন। আপনি যেখানেই থাকুন, এই খুনিদের বিরুদ্ধে মিছিল করে প্রতিবাদ করুন। প্রেসিডেন্সি জেলে ১৫০ জন বন্দী এক হাজার রাইফেলের বিরুদ্ধে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত লড়ে গেছেন। তাঁদের এই অসীম সাহস আপনাদের মনোবল দিক! এই সমস্ত খুনি মন্ত্রী এবং অফিসারদের ওপরে মৃত্যু পরোয়ানা জারি করুন। শ্রমিক ভাইসব! কারাগারগুলিতে অনশনরত আপনাদের সংগ্রামী সাথীদের মুক্ত করুন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সভা এবং শোভাযাত্রা করুন। পটারির শ্রমিকদের মতো মালিক আর তার দালাল পুলিসদের ওপর আক্রমণ করুন।

অ্যালানবেরির শ্রমিকদের মতো কারখানা দখল করে লাল ঝান্ডা ওঠান। শ্রীরামপুরের শ্রমিকদের মতো, দক্ষিণ কলকাতার নাগরিকদের মতো কংগ্রেস অফিস ধ্বংস করুন। মাহেশের শ্রমিকদের মতো পুলিস ফাঁড়ি এবং জেল আক্রমণ করে আপনাদের বন্দীভাই এবং অন্য বন্দীদের মুক্ত করুন।

'কৃষক ভাই সব। থানা, সাব-জেল এবং জেলা কারাগারগুলিতে আক্রমণ করুন। জমিদারের, জোতদারের এবং কালোবাজারিদের গোলার শস্য লুট করুন এবং সেগুলি বুভুক্ষু মানুষের মধ্যে বণ্টন করুন। জেল গেট ভেঙে আপনার সংগ্রামের সাথীদের ছিনিয়ে আনুন।

'ছাত্র এবং মহিলারা ১৪৪ ধারা ভেঙে আইন অমান্য করুন! কংগ্রেসি নেতা এবং অফিসারদের আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন শ্রেণীর পুলিস এবং সামরিক বাহিনীর লোকদের স্বপক্ষে টানার চেষ্টা করুন। বন্দীদের জীবন রক্ষার জন্য আপনারা বহুবার মৃত্যুকে অস্বীকার করে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আবার একবার এগিয়ে আসুন।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই সমস্ত অনশনকে হিংসা এবং ঘৃণা জাগানোর প্রচার-অস্ত্র হিসাবেই ব্যবহার করা হচ্ছে। এরকম অসংখ্য প্রচারপত্রের মধ্যে মাত্র কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল। এরকম আরও অনেক আছে। তাদের মধ্যে থেকে এবং কমিউনিস্টদের সংবাদপত্র থেকে একটির সংক্ষিপ্তসার নিচে তুলে দেওয়া হচ্ছে। 'হরতাল পালন করুন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে, শয়তানগুলিকে হুমকি দিয়ে বন্দীদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য করুন।

শ্রমিক শ্রেণী এগিয়ে এসে নিজেদের এই বীর সন্তানদের পাশে দাঁড়ান। প্রত্যেক কারখানায় হরতাল করুন। বন্দীদের দাবি মেনে নিতে এই পশু সরকারকে বাধ্য করুন। বন্দীদের সমর্থনে কোনও আন্দোলন যাতে সংগঠিত না হয় সেই জন্য এই সরকার সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারি করেছেন। এ আইন ভেঙে ফেলুন। মিছিল, মিটিং করুন। জেলগেটগুলি আক্রমণ করুন। সমস্ত ভয় ভীতি জয় করে এই সরকারের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসুন। বন্দীদের ছিনিয়ে আনুন।

'কারাগারের অন্ধকারে দিনের পর দিন রক্ত ঝরিয়ে আপনাদের সংগ্রামের সাথী ভাইরা অনশনে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ছেন। এই সরকারের হাত থেকে তাদের জোর করে ছিনিয়ে আনুন।'

'এই সরকার শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের নেতাদের বিনা বিচারে আটক এখনও বন্ধ করেনি... তাদের সাধারণ সশস্ত্র শত্রুর মতো হত্যা করতে বদ্ধপরিকর। প্রেসিডেন্সি জেলে এক হাজার পুলিস এবং রাইফেলের বিরুদ্ধে, ১২০ জন বন্দী অসীম সাহসে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত লড়াই করেছেন। কংগ্রেসি বর্বরতা অতীতের সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে আজ সভ্যতার সীমাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

'ট্রামের মজদুর ভাইসব! মিটিং, মিছিল, হরতাল এবং খুনি মন্ত্রী আর অফিসারদের ওপর আক্রমণের মাধ্যমেই আপনাদের সমস্ত ঘৃণা আর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। বন্দীমুক্তির আন্দোলনকে আরও জোরদার করুন।' 'কংগ্রেস সরকার হল শ্রমিক শ্রেণীর শত্রু। এদের টিকে থাকার কোনও অধিকার নেই। একে অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে।... পটারি শ্রমিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করুন। অ্যালানবেরির শ্রমিকদের মতো কারখানা দখল করে লাল ঝান্ডা তুলে দিন। শ্রীরামপুরের শ্রমিকদের মতো কংগ্রেসি নেতাদের বাড়ি আক্রমণ করুন। আই এন টি ইউ সি অফিস দখল করুন। কংগ্রেসি সরকারের রক্ষিতা-সংবাদপত্র অফিসগুলিও আক্রমণ করুন। ... রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে গরিব কৃষকদের জাগিয়ে তুলুন। তাঁদের বলুন 'এই সরকার আপনাদের জমি, রুটি সব কেড়ে নিচ্ছে এমনকি আপনাদের বেঁচে থাকার মজুরি থেকেও বঞ্চিত করছে। আপনাদের ছেলে, মেয়ে, ভাই, বোনদের জেলে পুরেছে এবং

সেখানেও তাঁদের হত্যা করছে। আপনাদের কমরেডদের মুক্ত করে আনার জন্য কংগ্রেস সরকারকে আক্রমণ করুন। জেল ও থানাগুলি ঘেরাও করুন। বন্দীদের মুক্ত করুন। জোতদার জমিদারদের গোলা থেকে শস্য কেড়ে নিয়ে গরিব কৃষকদের মধ্যে বিলি-বণ্টন করে দিন। জমির ওপর দখল রেখে সেই জমি চাষ করুন।'

'কংগ্রেসি কারাগারে মহিলা বন্দীদের উলঙ্গ করে অপমান করা হচ্ছে'— এই শিরোনামে এক প্রচারপত্রে বলা হয়েছে: 'অনশনরত মৃতপ্রায় মহিলা বন্দীদের চুলের মুঠি ধরে টেনেহিঁচড়ে পুলিস তাদের জেলে বন্দী করে। কনস্টেবলরা তাঁদের মাটিতে শুইয়ে মেঝের ওপর চেপে ধরে থাকে। ডি সি আর গুপ্তের নেতৃত্বে হায়দারের বাহিনী অনশনকারী মহিলা বন্দীদের ব্লকে জোর করে প্রবেশ করে এবং হুমকি দেয় যে তারা যদি অনশন না প্রত্যাহার করে, তাদের জঘন্যভাবে লাঞ্ছনা করা হবে। মহিলাদের সঙ্গে তারা জঘন্য ক্রিমিনালদের মতো আচরণ করে এবং লাঞ্ছনা করে। পুলিস এবং জেল অফিসাররা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সস্তায় মজা লুটতে থাকে। সাধারণ জেল এবং পুলিস কর্মচারীরা এ কাজ করতে অস্বীকার করায় বিশেষ গুন্ডাবাহিনী আনা হয়। কংগ্রেসি অত্যাচার ব্রিটিশ আমলের অত্যাচারকেও ছাড়িয়ে গেছে। দিল্লি থেকে নেহরু সরকার বন্দীদের কোনও দাবি না মানার নির্দেশ পাঠিয়েছে, হুমকি আর বল প্রয়োগ করে বন্দীদের কাণ্ডজ্ঞান ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছে।'

সমগ্র প্রচারপত্রটাই এইরকম অত্যাচারের গল্পে ভর্তি। যে ধরনের ঘটনার কথা বলা হয়েছে সেরকম ঘটনা আদৌ ঘটেনি— দিল্লির নির্দেশের গল্প একেবারে কল্পনাপ্রসূত। কমিউনিস্টরা মহিলাদের ওপর এই অত্যাচারের গল্প ফেঁদে শ্রমিক শ্রেণীকে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করেছে। তার প্রমাণ: 'মজদুর ভাইসব! আপনাদের বীর ভাইরা কারাগারের অন্ধকারে মৃত্যুপথযাত্রী। আপনাদের হাতুড়ি তুলে এই নির্যাতনকারীদের কোমরে আঘাত করুন। বন্দীদের জীবন রক্ষা করুন।' এই সংগ্রামে আগুয়ান হোন। একটা কারখানায় ধর্মঘট করেই পার্শ্ববর্তী কারখানার মালিক এবং দালালদের বাড়ি আক্রমণ করুন। ১৪৪ ধারা অমান্য করে নিজ নিজ এলাকায় জমায়েত করুন। শোভাযাত্রা নিয়ে আই এন টি ইউ সি অফিস আক্রমণ করুন। সেখানে আগুন ধরিয়ে দিন। আরও ব্যাপক মানুষকে সামিল করে শ্রীরামপুর ও ব্যারাকপুরের শ্রমিকদের নির্দেশিত পথে এগিয়ে চলুন। এলাকার জেল এবং পুলিস ফাঁড়িগুলি আক্রমণ করুন। কংগ্রেসি মন্ত্রী এবং নেতাদের বাড়িগুলি আক্রমণ করুন। শহরে শহরে কংগ্রেসি অফিসে আগুন ধরিয়ে দিন। শোভাযাত্রা করে সেক্রেটারিয়েট এবং রাইটার্স বিল্ডিং অভিমুখে যাত্রা করুন। জেল গেটগুলি আক্রমণ করুন। সরকারকে বন্দীদের দাবিগুলি মেনে নিতে বাধ্য করুন। আপনাদের মা-বোনেদের ওপর যে অত্যাচার করা হয়েছে তার যোগ্য জবাব দিন। বন্দী হত্যার বদলা নিন।'

## হায়দরাবাদ

হায়দরাবাদে পুলিসি অনুপ্রবেশে রাগে (নিজামকে রক্ষার জন্য এবং হায়দরাবাদকে ভারতের অঙ্গীভূত করার জন্য নেহরুর হায়দরাবাদ 'অভিযান এবং দখল' করার ঘটনার কথাই বলা হয়েছে এখানে — অনুবাদক) কমিউনিস্টরা সেখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ না করাটাকে ভীষণভাবে সমালোচনা করত। যেই ভারতের সেনাবাহিনী এবং পুলিস সেখানে ঢুকল ও জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের স্বাগত জানালেন, অমনি কমিউনিস্ট পার্টি তাদের নীতি বদলে ফেলল। তারা সরকারের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা করল। এমনকি যখন ভারতীয় সেনাবাহিনী হায়দরাবাদ শহরে ঢোকবার জন্য তখনও যুদ্ধ করছে, রাস্তা পরিষ্কার করছে, সেই সময় থেকেই কমিউনিস্টরা জনগণের উদ্দীপনা এবং উৎসাহে ভাটা আনার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার করে প্রচার চালাতে শুরু করল। তাদের উদ্দেশ্য ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য জনমানস তৈরি করা। এই সময় তারা একটা সার্কুলার দেয় যার নাম 'নিজাম বনাম ভারতীয়: দুই শক্তির লড়াই।' তাতে বলা হয়: 'অচিরেই নিজাম ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে। স্বভাবতই এখানে একটা কংগ্রেস প্রশাসন তৈরি হবে। এই প্রশাসনিক হাত বদল করতে দশ থেকে পনেরো দিন সময় লাগবে। এরই মধ্যে অন্যান্য সমস্ত অঞ্চলে আমাদের লড়াইগুলি ছড়িয়ে দিতে হবে। ৪-৫ দিনের মধ্যেই আমাদের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করতে হবে।...

'... কংগ্রেস সেনাবাহিনী কেন এসেছে? কংগ্রেস সরকারের সেনাবাহিনীর কাছ থেকে খুব বেশি প্রত্যাশাকে নিরুৎসাহিত করতে হবে। এই বাহিনী জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে গলা টিপে হত্যা করবে। জনগণের স্বার্থের পক্ষে এটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক। প্রত্যেকটি গ্রামে, শহরে, জনসভায়, মিটিং-মিছিল করে নিরবচ্ছিন্নভাবে জনগণকে বোঝাতে হবে— এই বাহিনীর হাত থেকে সব কিছুই রক্ষা করতে আমরা বদ্ধপরিকর। আমরা সরকারকে বাধ্য করব স্বীকৃতি দিতে। অবশ্যই তারা স্বীকার করে নেবে না। তখন সমস্ত শক্তি সংহত করে জনগণের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে আমরা বিজয়ের ফসলগুলো রক্ষা করব।'

এতে আরও বলা হয়েছে: 'রেললাইন তুলে ফেলে দিয়ে, টেলিগ্রাফের তার কেটে, রাস্তা ব্লক করে, সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করুন। যাতে গুন্ডাগুলি (মানে ভারতীয় বাহিনী) কোনও ক্রমেই সরে পড়তে না পারে। তাদের কোনও মতেই সরে পড়তে দেওয়া হবে না। ওদের ঘেরাও করার জন্য হাজার হাজার জনতাকে উৎসাহিত করতে হবে। ঘেরাও করে ওদের অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য করা হবে। লড়াই করার প্রস্তুতি

অবশ্যই রাখতে হবে। সমর্থক এবং আমাদের অনুগামী যে সমস্ত রাজাকার (নিজামের বাহিনী) তাদের জায়গা দিতে হবে। রাজাকারদের আতঙ্কিত করে তুলুন। যাতে তারা নিজেদের অস্ত্রগুলি বিক্রি করে দেয়, সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি কিনে নিতে হবে।

ভারতীয় বাহিনীর কাছে নিজামের আত্মসমর্পণের পর 'ভারত সরকার এবং নিজামের চুক্তি' নামক এক প্রচারপত্রে কমিউনিস্ট দল বলল— 'হায়দরাবাদে কংগ্রেসি শক্তি ঢুকেছে। নিজামের রাজাকার বাহিনী ছত্রাকার। কংগ্রেসি শক্তির উপস্থিতিতে প্রত্যেকের মনে একটা বিরাট প্রত্যাশা জেগেছে। তাদের মিষ্টি কথায় আর প্রতিশ্রুতিতে আমরা যেন না ভুলি।... আমরা জাগিরদের, ঘুষখোর, রক্তচোষা সরকারি কর্মচারীদের এলাকা থেকে দূর করে দিয়েছি। সব থেকে বড় কথা, আমরা একজনের বদলা নিয়েছি দশজন শ্রেণীশত্রু খতম করে। নিজাম এঁটে উঠতে না পেরে কংগ্রেসি সরকারের কাছে তার বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য আবেদন করেছে। তাদের ডেকে এনেছে। যে সমস্ত রাজ্যে কংগ্রেসি নেতারা রাজাকারদের ভয়ে প্রদেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা এখন ফিরে এসে আমাদের দমনের জন্য সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। তাদের সাহায্য করছে। সুতরাং ভাই সব! আমাদের গরিলা সংগ্রামকে তীব্রতর করার দিকে নজর দিন। অর্জিত মূল্যবান সামগ্রীগুলি রক্ষা করুন! দখলিকৃত গ্রামগুলি রক্ষা করুন! শেষ বিজয় না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রামহীনভাবে অগ্রসর হোন! শত্রু যেন আমাদের নাম না জানতে পারে। অপরিচিত লোক আমাদের সম্পর্কে কিছু খোঁজ করলে মুখে কুলুপ এঁটে থাকবেন। সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে পার্টির হাতে তুলে দিন। আক্রমণকারী বাহিনী যদি সংখ্যায় খুব বেশি না হয়, প্রত্যাক্রমণ করে এলাকা থেকে বিতাড়িত করুন। যদি দেখেন, শত্রু সংখ্যায় এবং শক্তিতে আমাদের থেকে ভারী, সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম এবং শহরগুলি পরিত্যাগ করুন। যদি আগে থেকে খবর পান, শত্রু বিশাল বাহিনী নিয়ে আসছে রেললাইন উপড়ে ফেলে, টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়ে, রাস্তা খুঁড়ে অগ্রসরণ ব্যাহত করুন। শত্রুর চলাচলের প্রতিটি খবর তৎক্ষণাৎ পার্টির কাছে পৌঁছে দিন। আমরা আমাদের জনগণের সরকার গড়ে তুলবই।

'কেন্দ্রীয় সরকারের সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতিজনিত সুবিধা এবং আমাদের কর্তব্য' শীর্ষক এক সার্কুলারে বলা হয়েছে:

'আমাদের হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবকদের ট্রেনিং দিতে হবে। ব্যাপকহারে জনসাধারণকে ট্রেনিং দিন। আমরা যত বেশি দক্ষতার সঙ্গে গেরিলা দলগুলি গড়ে তুলতে পারব, ততই বেশি আমরা ভারতীয় বাহিনীকে ধাঁধায় ফেলে দিতে পারব, ততই বেশি আমরা তাদের মোকাবিলা করতে পারব। এর জন্য তিনশো তিন নম্বর প্রশিক্ষণ দেওয়া অবশ্যই কর্তব্য। ... আমাদের বাহিনীগুলিকে বাড়ি এবং গ্রাম ঘিরে

ফেলার শিক্ষায় ভালভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। লরিগুলি থামানোর কৌশল সম্বন্ধে তাদের ভাল করে শিক্ষা দিতে হবে, যাতে তারা কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনীর যথাযথ মোকাবিলা করতে পারে এবং তাদের অবস্থান নির্ণয় করতে সক্ষম হয়!'

এইরকম অনেক সার্কুলার ছড়ানো হয়েছে। সেগুলি থেকে কিছু কিছু অংশ তুলে দেওয়া হল:

'গোপনে স্বেচ্ছাসেবক দল গড়ে তুলতে হবে। প্রত্যেককেই ভাল করে সামরিক ট্রেনিং নিতে হবে। অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে শিক্ষা নিতে হবে। এইরকম শিক্ষা দিতে পারলে শেষে আমরা শ' থেকে হাজারে পৌঁছুতে পারব। আমাদের নিয়মিত বাহিনী গড়ে উঠবে। প্রতিদিন তার সংখ্যা বাড়তে থাকবে।'

'যখন পুলিস কোনও গ্রামে বা শহরে ঢুকবে, পালিয়ে না গিয়ে হাতের কাছে যা পাবেন তাই নিয়ে আক্রমণ করুন। শত্রু যেন কোনও সময়েই বুঝতে না পারে যে, আমরা তাকে ভয় পাই। ভুল তথ্য সরবরাহ করে যতদূর পারেন শত্রুকে ধাঁধায় ফেলে দিন। টন টন পেট্রল আর লাখ লাখ টাকা খরচ করেও (যখন কোনও ফল পাবে না) শত্রুর গতি কমতে বাধ্য। আমাদের কেবলমাত্র গেরিলা যুদ্ধের ওপরই নির্ভরশীল হতে হবে।

'গেরিলা কৌশল দিয়ে কেবলমাত্র সশস্ত্র বিদ্রোহকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। প্রত্যেককেই অস্ত্র-ব্যবহারের ট্রেনিং নেওয়া উচিত। ৪ থেকে ৫ জনের গোপন দল সংগঠিত হোক। এই গোপন দল গঠন খুবই গোপনীয়তার সঙ্গে করতে হবে। এ ব্যাপারে চরম গোপনীয়তা অবলম্বন করতে হবে। সহিংস এবং আত্মঘাতী কাজকর্ম থামাবেন না। নানা উপায়ে সেগুলি করা যায়। রাস্তায় পেরেক পুঁতে মোটরগাড়ির চাকা ফুটো করে দেওয়া যায়। গ্রাম্য গোয়েন্দাগুলিকে চুপিসারে খতম করা যায়। যখন পুলিস গ্রামে ঢুকবে, বেবাক শান্ত ভালমানুষ সেজে হাতে বোমা ছুঁড়ে তাকে মারা যায়। খাদ্যে বিষ মিশিয়ে শত্রু খতম করা যায়। কাউকে কিছু জানতে না দিয়ে এগুলি করতে হবে।'

'গন্দদের (অন্ধ্রের উপজাতি) উচিত গ্রামে কারা শত্রুর গুপ্তচর বৃত্তি করছে, কারাই বা 'গন্দগ্রাম'গুলিতে পুলিস ঢুকতে সাহায্য করে, সে ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া এবং পার্টি 'দলম্'গুলিকে খবর সরবরাহ করা। সমস্ত যুবককে 'দলম্'-এর মধ্যে টেনে আনা উচিত। শহর এবং গ্রামে সমস্ত জায়গায় পুলিস ক্যাম্প লক্ষ্য করে হাত-বোমা ছুঁড়ুন। যখন এই জানোয়ার পুলিস কিংবা মিলিটারিকে একা একা পাবেন, তাদের খতম করে দিন। রাস্তাঘাট খুঁড়ে ওদের দ্রুত যাতায়াতের পথে অবরোধ তৈরি করুন। পুলিস ও মিলিটারির অত্যাচারে জর্জরিত গন্দদের সাহায্যার্থে টাকা এবং শস্য সংগ্রহ করুন।'

'ধ্বংস করুন' শীর্ষক এক সার্কুলারে কমিউনিস্ট পার্টি ছবি এঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে কেমন করে টেলিফোন, টেলিগ্রাফ পোস্ট, রেললাইন এবং রাস্তা ধ্বংস করতে হবে।

১৯৪১ সালের ২৬ এপ্রিল ভেলিভলু গ্রামে কমিউনিস্টদের দুশো জনের একটা দল একজন কংগ্রেসি নেতার বাড়ি আক্রমণ করে এবং চোখ উপড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। যা-ই হোক তিনি ওই দলের হাত থেকে পালাতে সক্ষম হন। ২ জন কংগ্রেসি নিহত এবং ৫ জন আহত হন।

'কিস্‌ট্‌নি' জেলা কমিটি কর্তৃক প্রচারিত একটি তেলুগু প্রচারপত্রে কমিউনিস্টরা এই খুন এবং লুটকে মহিমান্বিত করেছে। এটাকে ভেলিভলু গ্রামের মানুষদের 'রাক্ষস-নিধন' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা দাবি করেছে: '২০০ জন লোকের একটা সশস্ত্র দল ২ জন কংগ্রেসি গুন্ডাকে খতম এবং ৫ জনকে আহত করেছে ...'। শেষে বলা হয়েছে— 'এই সমস্ত গুন্ডার এটাই হল পরিণতি। যাই হোক, কমিউনিস্টদের আতঙ্ক ছড়ানোর এই সমস্ত গালগল্প প্রচারের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী পুলিসের সাহায্যে কমিউনিস্টদের শত্রু ঘাঁটি হিসেবে চিহ্নিত এলাকাগুলিতে আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে কমিউনিস্ট পার্টিকে যে বিবৃতি দিতে হয়েছে, সেটা বিস্তারিতভাবে তুলে দেওয়া হল:

'কংগ্রেস সরকার অপেক্ষাকৃত ভাল, এই বিশ্বাস এবং কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনীর আতঙ্ক বেশ কিছু পরিমাণে জনগণের মধ্যে গেড়ে বসেছে। ফলে জনগণের মধ্যে একটা দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব দেখা যাচ্ছে। এই দোদুল্যমানতা গেরিলাদেরও সংক্রামিত করছে। এরই জন্য 'দলম্'গুলি থেকে কিছু কিছু লোক আবার বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী সুশিক্ষিত, উন্নত অস্ত্রে সজ্জিত, এই মনোভাব সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। কয়েকটি 'দলমে' পিছিয়ে পড়া নানান চিন্তা দেখা যাচ্ছে।

যদি এই সমস্ত দোদুল্যমানতা কাটিয়ে না তোলা যায় তাহলে 'দলম্'গুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। শত্রুর প্রতিটি 'রেইড' বা হানায় 'দলম'-সভ্যদের পরিবারগুলোর ওপর অকথ্য অত্যাচার করা হচ্ছে। শত্রু অভিযানের তীব্রতা ভীষণভাবে বাড়িয়ে 'দলম' এবং গ্রাম কমিটির লোকদের পাকড়াও করার চেষ্টা করছে। তারা রাত-দিন এই হানা চালাচ্ছে। 'দলম' সদস্যরা মনে করছে, 'এ অবস্থায় তারা কিছুই করতে পারবে না। শত্রু আক্রমণ করার কোনও সুযোগই তাদের দিচ্ছে না। যখনই সময় এবং সুযোগ আসবে তখনই কেবল তারা আক্রমণ করে শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। এই ধরনের চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া মানে, সংগ্রামের অগ্রগতি অব্যাহত করা। কমরেডগণ! আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, এটা সশস্ত্র সংগ্রাম। কোনওরকম দ্বিধা দেখানো চলবে না।

'শত্রুপক্ষ থেকে বিবাদ বাড়ছে। এই সময় আত্মরক্ষার প্রশ্নে ভুল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা উচিত নয়। আত্মরক্ষা মানে কেবলমাত্র জঙ্গলে পালিয়ে যাওয়া নয়। তার মানে এ-ও নয় যে, যে সমস্ত অঞ্চলে গণআন্দোলনের জোয়ার আছে সেখানেই চলে যাওয়া। যদি এ-রকম ধারণায় ভুগি, তা হলে সেটা হবে আত্মহত্যার সামিল। তা হলে চিরুনি অভিযান চালিয়ে শত্রর পক্ষে আমাদের খুঁজে বার করা খুব সহজ হবে। এবং নিশ্চিহ্ন করাও। আর তারা সেটাই করবে; আক্রমণ ছাড়া আত্মরক্ষার সমস্যার কোনও অস্তিত্ব নেই। বার বার হামলাকারী শত্রুবাহিনীর ওপর আক্রমণ না করে আক্রমণ বা হামলার হাত থেকে বাঁচার পথই নেই। আত্মরক্ষা তখনই সম্ভব, যখন সুযোগ বুঝে শত্রুকে আক্রমণ করা যায় এবং তার পশ্চাদ্ধাবন করা যায়। যদি আমরা শত্রুকে আক্রমণ করতে চাই, অর্থাৎ আত্মরক্ষা করতে চাই, তাদের গোপন খবর জানতে হবে। যেই সুযোগ আসবে, আক্রমণ করেই সরে পড়তে হবে। সরে আসাটা আক্রমণেরই অংশ। আক্রমণ ছাড়া আত্মরক্ষা কোনও সময়েই সম্ভব নয়। সশস্ত্র শক্তির মোকাবিলা না করার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। গ্রামে পুলিস গুপ্তচরদের কাজকর্ম এবং নজরদারি সম্পর্কে বিশেষ কৌশলগত সাবধানতা নিতে হবে। রাস্তা থেকে দূরে দূরে আমাদের ক্যাম্প স্থাপনের ব্যাপারেও সাবধানতা নিতে হবে। শত্রুর গোপন খবর অবশ্যই আমাদের নিতে হবে। যদি সমস্ত সাবধানতা অবলম্বন করে আমরা আক্রমণ করতে পারি, দেখব শত্রু অজেয় নয়। ভয়কে আমাদের ঝেড়ে ফেলতে হবে। অহেতুক আতঙ্কে ভোগা চলবে না। মনে রাখবেন, যুদ্ধক্ষেত্রই আমাদের ট্রেনিং স্কুল। ফ্রন্টে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ভয় কাজ করতে থাকে। কিন্তু শত্রুর সত্যিকারের দৌড় বোঝা যায় যুদ্ধক্ষেত্রেই। নিজামের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় আমাদের 'দলম'গুলি যুদ্ধ-সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করেছেন। তাঁরা জানেন, কী করে ওত পেতে আক্রমণ করতে হয় এবং শত্রুকে ঘিরে ফেলতে হয়। তাঁরা কিছু অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছেন। এই অভিজ্ঞতা 'দলম'গুলিকে ট্রেনিং দিতে এবং শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। এখন আমরা 'আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামের পর্যায়' দিয়ে চলেছি। আমাদের একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কয়েকটা স্তর অতিক্রম করতে হবে। এ ব্যাপারে কিছুটা দক্ষতাও অর্জন করতে হবে, আমাদের 'দলম'গুলি এখনও সে-দক্ষতা অর্জন করেনি। যতদিন না 'দলম'গুলি অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করছেন, ততদিন পর্যন্ত আমাদের দ্বিতীয় স্তরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

যখন আমরা 'দলম'গুলিকে প্রস্তুত করছি, তখনই জনগণের মধ্যেও শত্রুর ওপর বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তোলা এবং তাদের আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি চালাতে হবে। তার মানে শত্রুর সঙ্গে সম্পূর্ণ অসহযোগিতা এবং প্রয়োজনে সময় আসলেই বিদ্রোহ

করা। যদি শত্রু নিষ্ঠুর আক্রমণ চালিয়ে জনগণের মেজাজকে দমন করার চেষ্টা করে, তা হলে আমাদের উচিত শত্রু ক্যাম্পের ওপর তড়িৎগতিতে আক্রমণ করা। বর্তমান অবস্থা যেমন করেই হোক রক্ষা করা উচিত। শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যাপক জনগণের বিশাল বাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ করুন। শত্রুকে আঘাত না করে এগুলির কিছুই করা সম্ভব নয়। কারণ, আমাদের পথ সশস্ত্র সংগ্রামের পথ। সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যতীত বিরোধিতার মেজাজ তুঙ্গে ধরে রাখা যায় না। শত্রুর বিরুদ্ধে সুযোগ পেলেই গেরিলা কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে হবে। এর সঙ্গে শত্রুর পরিবহণ ব্যবস্থার সব পথ অবরোধ করা— যেমন, বাস দখল করে নেওয়া, রাস্তায় পেরেক পুঁতে লরির চাকা পাংচার করা ইত্যাদিগুলিও চালানো যেতে পারে। এই সমস্ত অভিযানে ঝুঁকি অনেক কম, পশ্চাদপসারণও অনেক সহজ। কমরেডদের উপলব্ধি করতে হবে, এই প্রশিক্ষণগত সমস্যা একদিনের কাজ নয়। জীবনযাত্রার প্রতিদিনের দৈনন্দিন কাজের অংশ হিসেবে এই ট্রেনিং নিতে হবে। একই পদ্ধতির মধ্যে প্রশিক্ষণ হল— দু'ধরনের। এরা অবিচ্ছিন্ন এবং অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। একটা 'দলম' যখন শত্রুকে ঘেরাও করবে, অন্য দলের কাজ হবে আত্মরক্ষার জন্য তৈরি হওয়া। দুটো কাজই আমাদের একসঙ্গে করতে হবে। সুতরাং কেবলমাত্র আক্রমণের ট্রেনিং দিলেই হবে না। পশ্চাদপসারণের ট্রেনিং দিতে হবে। পিছিয়ে আসাটাও দক্ষতার সঙ্গে শিখতে হবে। ভবিষ্যতে আমাদের গতিপথের প্রতিটি পদক্ষেপই শত্রুর ঘেরাও-এর মুখে পড়তে পারে। আরও বেশি সংখ্যা এবং শক্তি নিয়ে সে আসতে পারে। বেশ কিছু 'রেইড' বা 'হানা' চালাতে পারে।

শত্রু-বৃত্ত ভেঙে সরে পড়া, হঠাৎ আক্রমণকে মোকাবিলা করা এবং পশ্চাদপসারণ প্রভৃতি পদ্ধতি বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে শিখতে হবে। এমনকি এই সমস্ত পদ্ধতি অনুশীলন করার জন্য আনুষঙ্গিক অন্যান্য অনেক ব্যাপারও অনুশীলন করতে হতে পারে। শত্রুর সতর্কতা সম্পর্কে কোনও ভুল ধারণা থাকা উচিত নয়, তা হলে মারাত্মক ক্ষতি হবে। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে শত্রু যেন কোনওরকমেই আমাদের অবস্থান না জানতে পারে। সুযোগ পেলেই শত্রুর টুঁটি চেপে ধরা উচিত, এবং তাকে ধ্বংস করা উচিত।'

সার্কুলার মারফত এই রকম নির্দেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কুৎসা এবং অপপ্রচার চালানো হয়েছে:

'কংগ্রেসি গুন্ডাদের ক্ষমা কোরো না। পুলিশ মিলিটারি যা করতে পারে না এই গুন্ডাগুলো সে কাজও করতে বদ্ধপরিকর। যেখানেই পাবে ওদের নিশ্চিহ্ন করো।'

# তৃতীয় অধ্যায়

## কমিউনিস্ট হিংস্রতার কিছু নমুনা

কেবলমাত্র পরিকল্পনা করেই বা প্রচার করেই কমিউনিস্টরা ক্ষান্ত থাকছে না। ঘৃণা ও হিংস্রতার এই কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য তারা তাদের যথাসাধ্য চেষ্টাও করছে। হায়দরাবাদে সশস্ত্র কমিউনিস্টদের সঙ্গে পুলিস এবং মিলিটারির বেশ কয়েকটা সঙ্ঘর্ষও ঘটে গেছে। সামান্যতম অনুশোচনাগ্রস্ত না হয়েই কমিউনিস্টরা এই সঙ্ঘর্ষগুলি অত্যন্ত নৃশংসভাবে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে চালিয়ে যায়। কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনীর অধিগ্রহণের পর তারা গ্রাম্য অফিসার ৪০০ জনকে ঠান্ডা মাথায় খুন করে। এটা হল ১৯৪৯ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত হিসাব। স্বামী এবং পুত্রদের তাদের স্ত্রী কিংবা মায়ের সামনে বা কোল থেকে টেনে এনে খুন করা হয়েছে। মহিলাদের ওপর তাদের মানুষগুলির হদিশ জানানোর জন্য অত্যাচার করা হয়েছে, বাড়িগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ গুন্ডামি করে তারা জনগণকে নিজেদের প্রভাবে রাখার চেষ্টা করেছে।

কলকাতা এবং অন্যান্য স্থানেও তারা নৃশংস হিংস্রপথ গ্রহণ করেছে। তাদের অনেক অনেক গুন্ডামির ঘটনার মধ্যে মাত্র দুটোর উদাহরণ এখানে তুলে দেওয়া হল। প্রথমটা হল ১৯৪৯ সালের ১৬ জুন তারিখে টালিগঞ্জে অবস্থিত অ্যালানবেরি কারখানার ঘটনা। কারখানার মালিক বেশ কিছুদিন ধরেই ওই কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার কথা ভাবছিলেন, কারণ কারখানাটা লোকসানে চলছিল। এর ওপর শ্রমিকরা অনবরত মাইনে এবং ভাতা বাড়ানোর জন্য জিদ ধরে আসছে। ১৯৪৯ সালের জুন মাসের ১৬ তারিখে মালিক লক-আউট করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। আগে থেকেই আশঙ্কা ছিল শ্রমিকরা কারখানা দখল করে নিতে পারে। সেইজন্য মালিক কলকাতা পুলিসের সাহায্য চান। লক-আউট ঘোষণার জন্য ১৫ তারিখ এস সি চ্যাটার্জি নামে এক নিরাপত্তা অফিসার নিয়োগ করা হয়।

যে করেই হোক নিরাপত্তা অফিসারের উপস্থিতি শ্রমিকরা টের পেয়ে যান। এক হাজার শ্রমিকের মধ্যে ৫০০ জনেরও বেশি কমিউনিস্ট প্রভাবিত শ্রমিক মধ্যরাত্রে কারখানায় অনুপ্রবেশ করেন। ১৬ তারিখ পুলিস যখন ঘটনাস্থলে আসে, তারা লরি এবং অন্যান্য যানবাহন দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করে। কী ঘটে দেখার জন্য পুলিস অপেক্ষা করতে থাকে। বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ কারখানা কর্তৃপক্ষ টালিগঞ্জ থানায় ফোন করে জানান তাঁদের নিরাপত্তা অফিসারকে পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিস তদন্তে নামে। ১৭ই জুন পুলিস কারখানায় ঢোকে, কিন্তু দারোয়ান ছাড়া আর কোনও শ্রমিককে

দেখতে পায় না। একটা ট্রাকের নিচে মাটির তলা থেকে মিঃ চ্যাটার্জির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। খুব ঠান্ডা মাথায় খুন করে তাকে কবর দেওয়া হয়। একজন শ্রমিকের দেওয়া সেই কবর থেকে তাঁকে তুলে পোস্টমর্টেমে পাঠানো হয়। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে দেখা যায় অসংখ্য ক্ষত। এটা পরিষ্কার যে নৃশংসভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি শুরু হয় ফেব্রুয়ারি মাস থেকে। ২৬ শে ফেব্রুয়ারি একইসঙ্গে একই সময়ে কমিউনিস্টরা দমদম বিমানবন্দরের কাছে অবস্থিত গানশেল কারখানা, জেসপ কারখানা, দমদম পুলিস ফাঁড়ি এবং পশ্চিমবাংলার বসিরহাট থানা আক্রমণ করে। এইসব আক্রমণে বোমা, স্টেনগান, রিভলভার প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। আক্রমণকারীরা ট্যাক্সিতে এবং গাড়িতে আসে। বিমানবন্দরে একজন পুলিস আহত হয়। বেয়নেট সমেত সাতটা রাইফেল ছিনতাই হয়। বোমা-পটকা ছোঁড়া হয়। মাটিতে রাখা একটি বিমানেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সোনা মজুত ভল্টের পাহারারত কনস্টেবল আহত হন। পরে বিমানবন্দরের অফিসারেরা ১৫টি বোমা-সহ একটা থলে উদ্ধার করেন, আক্রমণকারীরা এটা ফেলে গিয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে নৃশংস ঘটনা ঘটে 'জেসপ' নামে একটি অন্যতম বৃহৎ ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায়। এখানে তারা কর্তব্যরত অফিসারদের আক্রমণ করে। একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ফোরম্যানকে মারাত্মকভাবে জখম করে। তিনজন ইউরোপীয় অফিসারকে জ্বলন্ত চুল্লি (ফার্নেস)-তে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে পরে তাদের পোড়া মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। এই সমস্ত ঘটনা একটা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রেরই বহিঃপ্রকাশ। বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির একাংশ (আর সি পি আই পান্নালাল দাশগুপ্ত গোষ্ঠী— অনুবাদক) এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই সমস্ত হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে।

যেখানেই তারা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে লোকজনকে নিজেদের পক্ষে টানতে ব্যর্থ হচ্ছে, সেখানেই তারা আতঙ্ক সৃষ্টির পথ নিয়েছে। এ ধরনের ঘটনার পরিমাণ এত বহুল যে সব লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। পরিশিষ্টে কয়েকটি তুলে ধরা হয়েছে।'

# চতুর্থ অধ্যায়

## জনগণের প্রতিরোধ

খুবই সম্প্রতি ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কলকাতায় যান এবং ময়দানে একটি জনসভায় ভাষণ দেন। কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য বামপন্থী দল এই মিটিং বয়কট করার আহ্বান জানায়। যা-ই হোক, প্রায় দশ লক্ষ মানুষ প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুনতে আসেন। এই সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত জোর দিয়ে জনগণের কাছে আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, তাঁরা যেন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকে একদম বরদাস্ত না করেন। আইনভঙ্গকারীদের সম্পর্কে ভীত না হওয়ার জন্য তিনি আবেদন করেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রী তাঁদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। যখন প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিচ্ছিলেন, জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য সমাবেশে একটি বোমা ফাটানো হয়। জনগণ মোটেই আতঙ্কিত না হয়ে, শান্ত থেকে এবং সুশৃঙ্খলভাবে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুনে যান। হিংসার রাস্তায় আতঙ্ক সৃষ্টির বিরুদ্ধে জনগণের এই মেজাজ ষড়যন্ত্রীদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে। ময়দানে যা ঘটেছে তার মর্ম হল হিংসার পথের পথিক কমিউনিস্টদের প্রতি জনগণের বীতরাগ এবং প্রতিরোধ। ১৯৪৮ সালের ১৮শে জুন, উত্তর কলকাতায় কমিউনিস্টদের একটা মিছিলে কলকাতা পুলিসের গোয়েন্দা শাখার একজন সাব-ইনস্পেক্টরের আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে, স্থানীয় জনসাধারণ দুষ্কৃতীদের তাড়া করেন। ১৯৪৯ সালের ১৯শে জুন পুলিস এবং দমকলবাহিনীর সঙ্গে এক বিশাল জনতা সহযোগিতা করে ট্রাম কোম্পানিকে একটা বড় ধরনের ক্ষতির হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।

কান্নারে কমিউনিস্ট প্রভাবে থাকা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের শতাধিক বিড়ি শ্রমিক কংগ্রেসি পতাকা হাতে কমিউনিস্টবিরোধী স্লোগান দিয়ে পথসভা করেন। এঁরা প্রত্যেকেই বর্তমানে কমিউনিস্ট পার্টির হিংসার রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন।

১৯৪৯ সালের ১১ই আগস্ট পশ্চিমবাংলার বালুহাটি স্টেশনে জনগন একদল কমিউনিস্টকে ডাকাত বলে আটক করেন এবং পরে পুলিসের হাতে দেন। পুলিসকে তাদের উপস্থিতি জানানো হলে পুলিস আসে, এবং তারা গুলি ছাড়তে শুরু করে, পুলিসও প্রত্যুত্তরে রাইফেল ও রিভলভার থেকে গুলি ছোঁড়ে। সামনাসামনি এ লড়াইয়ে দুজন দুষ্কৃতী ধরা পড়ে। একজনকে পুলিস হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়।

১৯৪৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর দুপুর নাগাদ স্টেনগান-সহ একদল সশস্ত্র কমিউনিস্ট হাওড়ার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শাখায় ডাকাতির পর যখন চলে যাচ্ছিল,

স্থানীয় মানুষ তাদের তাড়া করে দুজনকে ধরে ফেলে। এই দলের নেতা দমদম মামলার আসামি, আত্মগোপনকারী এক ব্যক্তি। সে-ও ধরা পড়ে। তার কাছ থেকে একটা গুলিভরা পিস্তল এবং কিছু টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। আরও তিনজনকে পুলিস এবং জনতা তাড়া করে ধরে ফেলে (নেহরু তাঁর ভাষণে এটা কমিউনিস্ট পার্টির ঘাড়ে চাপালেও আসলে এটা আর সি পি আইয়ের কাজ, ব্যাঙ্ক লুটের পর ধরা পড়ে যান পান্নালাল দাশগুপ্ত— লেখক)।

উত্তর মালাবারে কমিউনিস্টরা যে অবস্থার সৃষ্টি করেছিল সেখানেও দলের উচ্ছৃঙ্খল কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ আস্তে আস্তে বাড়ছে, অবস্থার উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মালাবার জেলা শ্রীনারায়ণ ধর্ম পরিপালনের এক সভা কমিউনিস্ট কার্যকলাপের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। ১৯৪৮ সালের ২৫শে এপ্রিল মেলুরে (উত্তর মারাবারে) এক বৃহৎ জনসভা কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণার দাবি করেছে।

২৫শে এপ্রিল, ১৯৪৯ সালে কলকাতার স্টুডেন্টস হলে এক সভার পর ছাত্র ফেডারেশনের ২০০ জন কর্মী একটি মিছিল বার করে। বউবাজার স্ট্রিট ধরে এগোতে থাকে। কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে পৌঁছলে পুলিস তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। সেই সময় তারা ছোট ছোট দলে পুলিসকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকলে একদল মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে মিছিলকারীদের মোকাবিলা করে। জনগণের বক্তব্য— এদের কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজকর্মের ফলে পুলিস গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হবে। যার ফলে সাধারণ মানুষের ক্ষতি আর হয়রানি। জনতা এবং ছাত্রদের মধ্যে বচসা উত্তেজনাকর অবস্থায় পৌঁছলে পুলিস ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

১৯৪৯ সালের ২৯শে মে, কমিউনিস্ট ছাত্র সংগঠন, ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কাছে সাদা পোশাকের এক গোয়েন্দা পুলিসকে আক্রমণ করার চেষ্টা করলে জনগণ পুলিসটিকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে এবং শেষপর্যন্ত পুলিসবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে ১৮ জন দাঙ্গাবাজকে গ্রেপ্তার করে। জনগণের মধ্যে আটজন সোডাবোতল, ইট, বোমা, অ্যাসিড বাল্ব প্রভৃতির ঘায়ে গুরুতরভাবে জখম হন। বেশ ভাল সংখ্যায় জমায়েত হয়ে জনগণ কমিউনিস্ট বিরোধী স্লোগান দিতে থাকে এবং সন্দেহভাজন কমিউনিস্টদের আক্রমণ করে।

১৯৪৮ সালের ১৭ই মে মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন দেশরক্ষা সমিতির সদস্যরা বেশ কিছু আত্মগোপনকারী কমিউনিস্টকে আটক করে পুলিসের হাতে তুলে দেন। গত ১৪ই মে মানাপুরম জেলার (উত্তর মালাবার) এক রাজনৈতিক সভায় কমিউনিস্টদের হিংস্র কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করানো হয়েছে

এবং সভা কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছে। আত্মগোপনকারী কমিউনিস্টদের সম্পর্কে এই এলাকার সাধারণ মানুষ আরও বেশি বেশি করে পুলিসকে খবর দিচ্ছেন। ১৬ই মে ১৯৪৮ সালে, মানুরগুড়ি (তানজোর) অঞ্চলের মানুষরা দল বেঁধে কমিউনিস্ট প্রভাবিত অঞ্চলে কমিউনিস্টদের হিংস্র কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রচার চালান। সম্প্রতি কলকাতাতে প্রধানমন্ত্রীর সফরের সময় একটা মিছিল স্লোগান দিতে দিতে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছুঁড়তে থাকলে পুলিস আসার আগেই দর্শকেরা তাদের লাঞ্ছিত করেন।

১৯৪৯ সালের ১৭ই মার্চ এরালা পল্লী অঞ্চলে জনগণ বীরম রেড্ডি এবং রামচন্দ্র রেড্ডি নামে দুজন কুখ্যাত আত্মগোপনকারী কমিউনিস্টকে পুলিসের হাতে তুলে দেয়। ঐ বছরেই ১২ই আগস্ট কলকাতায় ছাত্র কংগ্রেসের একটি মিটিং কিছু কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন ছাত্র পণ্ড করে দেওয়ার চেষ্টা করে। ঐ লনেরই অন্য জায়গায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের একটি সভা হচ্ছিল। সেখান থেকে ছাত্র কংগ্রেসের সভা লক্ষ্য করে দুটি বোমা ছোঁড়া হয়। সভা পণ্ড করে দেওয়ার এই খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং দলে দলে ছাত্ররা লনে জমায়েত হন। সভ্য পুনরায় শুরু হয়। কিন্তু ছাত্র কমিউনিস্টদের এই কার্যকলাপের নিন্দা করে ভাষণ দেন। পরে মিছিল করে তারা সিটি এবং স্কটিশচার্চ কলেজের সামনে যান, সেখানেও সভা করেন এবং কমিউনিস্টদের পোস্টারগুলি ছিঁড়ে ফেলেন। রামগড়ে মহারাজপুরম গ্রামের কিছু কৃষক এ শ্রীনিবাসন নামক জনৈক আত্মগোপনকারী কমিউনিস্টের প্ররোচনায় গ্রামের সাধারণ পুকুরে মাছ ধরতে যান। এই ঘটনায় পুলিস কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। খবর পেয়ে শ্রীনিবাসন একটি বেআইনি বন্দুক এবং লাঠিসোটা নিয়ে গ্রামের ওপর চড়াও হয়, গ্রামবাসীদের মারধর করে। গ্রামবাসীরা জমায়েত হয়ে শ্রীনিবাসন এবং তার দুজন সহকর্মীকে আটক করে এবং পুলিসের হাতে তুলে দেয়। ৩১শে মার্চ প্রায় ৫০ জন কমিউনিস্টের একটা দল কাটারু এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল গন্নভরম তালুকে নারলা রামালিংগমা নামে একজনকে বল্লম দিয়ে খোঁচায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। গ্রামবাসীরা আক্রমণকারীদের একজনকে আটক করে পুলিসের হাতে তুলে দেয়। কে জি গোপালন নামে একজন নামী আত্মগোপনকারী নেতা জনগণের হাতে ধরা পড়ে এবং গ্রামবাসীরা তাকে পায়ানুর থানার পুলিসের হাতে তুলে দেয়। আরিকুলাম এবং এর্নাকুলাম ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুজন কমিউনিস্টকে গ্রামবাসীরা পুলিসের হাতে তুলে দেন। কিছু মারাত্মক ধারালো অস্ত্রও তাঁরা উদ্ধার করেন।

# পঞ্চম অধ্যায়

## সিদ্ধান্ত

বর্ণিত ঘটনাগুলি নিঃসন্দেহে এটা প্রমাণ করে এবং আমরা আশাও করতে পারি যে, কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জনগণ একটা স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তুলছেন এবং প্রতিরোধে এগিয়ে আসছেন। কোন দলকে তাদের মত এবং পথ সম্পর্কে প্রচার করতে দিতে, কিংবা কেউ যদি মনে করেন তাঁরা এই সরকারের পরিবর্তে অন্য ধরনের সরকার দ্বারা সমস্যার সমাধান চান, তাতেও সরকারের কোনও আপত্তি নেই। কোনওরকম রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ধারণা প্রচারে বাধা দেওয়ার ইচ্ছাও সরকারের নেই। ভারত সরকার কোনও মত ও পথের শান্তিপূর্ণ এবং গণতান্ত্রিক প্রচার রোধ করতে চান না। বরং তাঁরা ব্যাপক সুযোগ এবং সুপ্রশস্ত পথ খোলাই রেখেছেন। কিন্তু কোনও মতেই কোনও দলের বা অংশের (তা তার রঙ যা-ই হোক না কেন) অন্তর্ঘাতী এবং হিংস্র কার্যকলাপকে সরকার বরদাস্ত করতে পারে না।

যে কমিউনিস্ট পার্টি ক্লান্তিহীনভাবে 'নাগরিক অধিকার' এবং 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' ধ্বংস করে দিচ্ছে বলে সরকারের সমালোচনা করছে, তারাই অন্যদিকে পোস্টারে, প্রচারপত্রে, দেওয়াল লিখনে ও মুখে খুন, অন্তর্ঘাত ও আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলার অধিকারকে স্বীকৃতি দিচ্ছে এবং এগুলির জন্য ওকালতি করছে। তারা তাদের নিজেদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের এবং জনগণের উচিত এবং ন্যায্য কাজ করার অধিকারকেই স্বীকার করে না। এরকম একটা অবস্থা কোনও ক্ষমতাসীন দলই চলতে দিতে পারে না। নিজেদের এবং জনগণের ধনপ্রাণের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শক্তিশালী হওয়া ব্যতীত কোনও উপায় নেই। হয় নিজেদের ধ্বংস হতে দেওয়ার অধিকারকে স্বীকার করে নিতে হয়, না হয় এগুলি সম্পর্কে নির্বিকার থাকাটা বন্ধ করতে হয়। সুতরাং নির্বিকার থাকা যায় না। সরকারের যা আছে, তাই নিয়েই তারা এই বিশৃঙ্খলার মোকাবিকা করতে বদ্ধপরিকর এবং এ ব্যাপারে আমাদের সরকার নিশ্চিত যে জনগণের সমস্ত অংশ থেকে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা এবং সমর্থন সে পাবে।

আরও উন্নত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবন গড়ে তোলার জন্য আইনের রাজত্ব ফিরিয়ে আনতেই হবে।

# পরিশিষ্ট —২

১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে ৩০শে আগস্ট পর্যন্ত ঘটে যাওয়া কমিউনিস্ট দুষ্কর্মের একটা তালিকা পেশ করা হল:

## আসাম প্রদেশ

স্থান: বেলতলা অঞ্চল কামরূপ জেলা

সময়: ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহ

বিবরণ: 'খাজনা দেব না' আন্দোলন প্রচারকালে একদল কমিউনিস্ট একজন চৌকিদারের কাছ থেকে তার মালিকের গোলার চাবি চায়। সে দিতে অস্বীকার করলে একেবারে তাকে গুলি করা হয়। তার স্ত্রী তাকে বাঁচাতে এলে সে-ও মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়।

স্থান: নালিয়াপোল রেল কলোনি, থানা ডিব্রুগড়, জেলা লখিমপুর

সময়: ১৬.৭.৪৯

বিবরণ: জুলাই মাসের ১৬ তারিখের গণনাট্য সঙ্ঘের এবং শান্তি কমিটির শিবিরের স্বেচ্ছাসেবক একদল কমিউনিস্টদের সাথে সভাতে প্রবেশেচ্ছুক কিছু লোকের গন্ডগোল বাধে। স্বেচ্ছাসেবকেরা বাইরের এই লোকেদের জঘন্যভাবে আক্রমণ করে। একটা মামলা দায়ের করা হয়। যখন থানা থেকে পুলিস আসে, তাদের ঘিরে ফেলা হয় এবং আক্রমণ করা হয়, পুলিস দলের প্রত্যেকেই আক্রান্ত হন। একজন এস আই গুরুতরভাবে আহত হন। পরে তাঁকে হত্যা করা হয়, তাঁর মুখের ভেতর অ্যাসিড ঢেলে খোলা পায়খানার মল-মূত্রের মধ্যে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। যখন শক্তিশালী হয়ে আরও পুলিস ঘটনাস্থলে যায় তারাও একইরকম ভাবে আক্রান্ত হয়।

স্থান: আমগুড়ি ও নামতিয়ালি রেললাইনের মাঝে

সময়: ১৯.১.৪৯

বিবরণ: কয়েকজন সশস্ত্র কমিউনিস্ট একটি ট্রেনের কামরায় উঠে পড়ে এবং পে-ক্লার্ককে গুলি করে। চৌকিদারকে ঠেলে ফেলে দিয়ে একটি রাইফেল এবং এক লক্ষ টাকা নিয়ে চেইন টেনে মাঝপথে নেমে পড়ে।

## পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ

স্থান: সন্তোষপুর, থানা জগৎবল্লভপুর, জেলা হাওড়া

সময়: ৬.৭.৪৯

বিবরণ: মিশ্রী মান্না নামে ডোমজুড়ে সন্তোষপুরে জনৈক গ্রামবাসী গত কৃষক আন্দোলনের সময় পুলিসের সাহায্য করার অপরাধে ৬ তারিখে রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে একদল কমিউনিস্টের হাতে আক্রান্ত হয়। তাকে কুপিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে তার দেহ রেল লাইনে ফেলে রাখা হয়।

স্থান: লয়ালগঞ্জ, থানা কাকদ্বীপ, জেলা ২৪ পরগনা

সময়: ২-৩.৬.৪৯

বিবরণ: ১৯৪৯ সালের ২রা/৩রা জুন কৃষক সমিতির শতাধিক ব্যক্তি লাঠি, বল্লম প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দ্বারিকনাথ সামন্তের কাছারিবাড়ি এবং দেবেন জানার বাড়ি চড়াও হয়। দেবেন জানা এবং তার স্ত্রী পুঁটি জানাকে টেনে বার করে আনা হয়, দরোয়ান কোনও রকমে পালিয়ে যেতে পারে। পরে আক্রমণকারীরা পুঁটি জানা এবং মন্মথ জানাকে ঘরে ফিরে আসতে দেয়। দেবেন জানার মাকে হত্যা করা হয়। তার মৃতদেহ পাওয়া যায়নি।

স্থান: ডামরা, থানা মহম্মদ বাজার, জেলা বীরভূম।

সময়: ২১-৬-৪৯

বিবরণ: বীরভূম জেলার মহম্মদবাজার থানার ডামরা গ্রামে কিছু কমিউনিস্ট সাঁওতালদের নিয়ে একটা সভা করে। তাতে বড়লোকদের খুন করতে এবং সম্পত্তি লুট করতে তাদের উত্তেজিত করা হতে থাকে। সভায় উপস্থিত এক ধনী কৃষক এর প্রতিবাদ করলে কমিউনিস্টরা তাকে ধাওয়া করে এবং খুন করে।

স্থান: নামাজাদা, গড়বেতা থানা, জেলা বীরভূম।

সময়: ২৪-৭-৪৯

বিবরণ: ১৯৪৯ সালের ২৪শে জুলাই মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার নামাজাদা গ্রামের আবেন খানের বাড়িতে বিশজন কমিউনিস্টের একটা দল ডাকাতি করে। সে, তার ভাই হাবিব খান এবং তার স্ত্রী মারাত্মকভাবে জখম হয়। সমস্ত অস্থাবর মূল্যবান সম্পত্তি লুট করা হয়।

স্থান: শিবপুর, জেলা হাওড়া।

সময়: ১২-৯-৪৯

বিবরণ: সেপ্টেম্বর মাসের ১২ তারিখ দুপুর ১২টা নাগাদ স্টেনগান, রিভলভার, বোমা, পিস্তল নিয়ে চারজন কমিউনিস্ট একটি ট্যাক্সির চালককে বাধ্য করে, তার ট্যাক্সিতে চড়ে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সামনে নামে এবং আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে কর্মচারীদের আতঙ্কগ্রস্ত করে। কাউন্টার থেকে টাকা লুট করে। ব্যাঙ্কে ঢোকার আগে তারা দারোয়ানকে কাবু করে তার অস্ত্র এবং গোলাবারুদ সব নিয়ে চম্পট দেয়। (নেহরু একে কমিউনিস্ট পার্টির কাজ বললেও, আসলে এটিও আর সি পি আই পান্নালাল দাশগুপ্তের কাজ, তিনি ফেরার পথে ওই দিনই গ্রেপ্তার হয়ে যান— লেখক)।

## কলকাতা

স্থান: মধ্য কলকাতা

সময়: ১৮-১-৪৯

বিবরণ: কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে একদল ছাত্র জনসাধারণকে উত্তেজিত করে। রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করে। প্রায় আধ ডজন ট্রাম এবং সরকারি বাসে আগুন ধরায়। অনুগত ট্রাম কর্মচারীদের আক্রমণ করে। বোমা এবং অন্যান্য ক্ষেপণযোগ্য বস্তু দিয়ে পুলিসকে আক্রমণ করে।

স্থান: বিজ্ঞান কলেজের উল্টোদিকে সার্কুলার রোড, শিয়ালদহ স্টেশনের উল্টোদিকে আপার সার্কুলার রোড, আশুতোষ ভবনের সামনে, কলেজ স্ট্রিট।

সময়: ২৮-৪-৪৯

বিবরণ: কমিউনিস্টরা বোমা, সোডার বোতল প্রভৃতি নিয়ে ট্রামে-বাসে আগুন ধরিয়ে আবার পরিবহণ ব্যবস্থা বানচাল করার চেষ্টা করে। বেশ কিছু যাত্রীকে তারা জখম করে।

স্থান: মিশন রো

সময়: ১২-৫-৪৯

বিবরণ: লিপটন কোম্পানির শ্রমিকদের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে দুই দল শ্রমিকের বচসা শুরু হয়। তারা বোমা, সোডার বোতল প্রভৃতি নিয়ে আক্রমণ করে। বেশ কিছু শ্রমিক আহত হয়। একটি লরিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

স্থান: বেঙ্গল পটারি

সময়: ৩-৬-৪৯

বিবরণ: কমিউনিস্টদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে বেঙ্গল পটারির শ্রমিকরা অত্যন্ত বেআইনিভাবে কারখানা চত্বর দখল করে নেয়। মেশিনপত্র ধ্বংস করে। গুদাম ভাঙচুর করে এবং অন্যান্য আসবারপত্রে আগুন ধরিয়ে দেয়। অফিসারদের লাঞ্ছিত করতে

থাকে। অফিসারদের উদ্ধারের জন্য পুলিস বাহিনী গেলে তাদের ওপর ইট-পাথর-বোমা প্রভৃতি নিয়ে আক্রমণ করে।

স্থান: দেশপ্রিয় পার্ক

সময়: ৫-৬-৪৯

বিবরণ: ৪০০ জনেরও বেশি কমিউনিস্ট নির্বাচন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের সভা পন্ড করে দেওয়ার জন্য ওই এলাকায় গন্ডগোল করে। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক এবং সভার নেতাদের জঘন্যভাবে লাঞ্ছিত করে। বাছবিচার না করেই ইট-পাথর-বোমা-সোডার বোতল ছুঁড়তে থাকে। জাতীয় পতাকাও পুড়িয়ে দেয়। তারপর কংগ্রেস প্রার্থীর বাড়ি এবং কারখানা আক্রমণ করে।

স্থান: ব্রিগেড প্যারেড ময়দান

সময়: ১৪-৭-৪৯

বিবরণ: মহামান্য প্রধানমন্ত্রী শ্রী জওহরলাল নেহরু সভা পন্ড করার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্টরা সভা লক্ষ্য করে ইট-পাথর-বোমা ছোঁড়ে। পুলিসকে লক্ষ্য করে একটা শক্তিশালী বোমা ছোঁড়া হয়— এর ফলে একজন কনস্টেবল নিহত এবং তিনজন আহত হয়। একজন কমিউনিস্ট প্রধানমন্ত্রীর পাহারাদার পুলিসের দিকে তাক করে পিস্তল দিয়ে গুলি ছুঁড়তে থাকে। আমাদের সৌভাগ্য তার নিশানা ব্যর্থ হয়েছে।

## বিহার প্রদেশ

স্থান: পাংখাটোলা, মুজফ্‌ফরপুর

সময়: ১১-৪-৪৯

বিবরণ: মিউনিসিপ্যালিটি শ্রমিকদের মধ্যে পাল্টা ইউনিয়ন গড়ে তোলার চেষ্টার অপরাধে মুজফ্‌ফরপুর জিলার কিছু কমিউনিস্ট জিওয়াছ প্রসাদ নামে একজন শ্রমিক জমাদারকে হত্যা করে।

স্থান: সাগুনি, থানা- পরসা

সময়: ৮-৭-৪৯

বিবরণ: কমিউনিস্টরা চামারদের গ্রামে, জমিদার এবং ধনী কৃষকদের কাছ থেকে বেশি মজুর আদায়ের জন্য চামারদের উত্তেজিত করতে থাকে। একজন গ্রামবাসী এর প্রতিবাদ করলে তাকে ছুরি মেরে হত্যা করা হয়।

## হায়দরাবাদ প্রদেশ

স্থান: উৎলাপল্লী ডেবরা কোঁড়া, তালুক গলগোন্ডা

সময়: ১২-১-৪৯

বিবরণ: সশস্ত্র কমিউনিস্টদের একটা দল গ্রামে অভিযান চালিয়ে দু'জনকে হত্যা করে। চারজনকে তুলে নিয়ে যায়।

স্থান: পাপাকোল এলাগড়ু, তালুক ওয়ারাঙ্গল

বিবরণ: একদল কমিউনিস্ট গ্রামে অভিযান চালিয়ে একজনকে হত্যা করে। কয়েকজনকে মারধর করে এবং সম্পত্তি লুট করে।

স্থান: কাম্মাগুড়া, আতরাফ-এ বলড়া

সময়: ৪-২-৪৯

বিবরণ: আইনের প্রতি অনুগত বিশ্বস্ত কিছু গ্রামবাসীকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়। গ্রামসভার অফিসঘর সব নথিপত্র সমেত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

স্থান: গোরগুস্থাপালান মিরজালগুড়া, তালুক নালডাঙ্গা।

সময়: ৭-২-৪৯

বিবরণ: একদল কমিউনিস্ট খুব ঠান্ডা মাথায় তিনজন গ্রামবাসীকে হত্যা করে। দু'জনকে তুলে নিয়ে যায়— কারণ তারা ওদের কাছে মাথা নত করেনি।

স্থান: কাটাপুর মুলুং, তালুক ওয়ারাঙ্গল

সময়: ৯-২-৪৯

বিবরণ: কমিউনিস্টরা গ্রামে অভিযান চালিয়ে চারজন গ্রামবাসীকে গাছের সঙ্গে বেঁধে গুলি করে হত্যা করে।

স্থান: বেকটসরম, থানা- অমরাবাদ, মহবুবনগর

সময়: ২৫-২-৪৯

বিবরণ: একজন বিশ্বস্ত গ্রামবাসীকে জঙ্গলের মধ্যে ধরে এনে খুন করা হয়।

স্থান: চেতলামুদপুরম খায়রাপল্লী, এল্লানাড়ু, তালুক ওয়ারাঙ্গল

সময়: ৪-৩-৪৯

বিবরণ: রয়ালা নরসিয়া নামে একজন কংগ্রেস কর্মী কমিউনিস্টদের হাতে খুন হয়।

স্থান: গোবিন্দপুরম কামাম, তালুক ওয়ারাঙ্গল

সময়: ৬-৪-৪৯

বিবরণ: একজন অনুগত গ্রমবাসী কমিউনিস্টদের হাতে খুন হয়

স্থান: ইন্দুরতি, আতরাফ-এ বলড়া

সময়: ৮-৪-৪৯

বিবরণ: একজন অনুগত গ্রামবাসীকে কমিউনিস্টরা হত্যা করে।

# পরিশিষ্ট —৩

## সূচনা : সংস্কৃতি

মানুষ সাংস্কৃতিক জীব। মানুষের যদি কেবলমাত্র জীবিকার তাড়নাই থাকত, যদি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক তাগিদই থাকত তা হলে মানুষ আর মনুষ্যেতর জীবের মধ্যে কোনও ফারাক থাকত না। মানুষ চলত প্রবৃত্তির বশে। মানুষের সাংস্কৃতিক কাজকর্মই মানুষকে দিয়ে প্রবৃত্তিকে বশ করিয়েছে। এই বশে আনাটা মানুষের মধ্যেই অনেকে ভাল চোখে দেখেন না, অনেকে দেখেন।

আগুনকে বশে এনে প্রবৃত্তিকে বশে আনার প্রথম পাঠ যেদিন মানুষ শিখল সেদিন থেকেই শুরু হল মানুষের মানুষ হিসেবে জয়যাত্রা। প্রমিথিউসের আগুন চুরির ঘটনাকে তাই আমরা বলতে পারি দেবতাদের সংস্কৃতির জগতে সাধারণ হামলা। অবশ্য সিগমন্ড ফ্রয়েড নামে এক ভদ্রলোক, যিনি নিজেকে বৈজ্ঞানিক বলে দাবি করেন, তিনি বলেছেন, এটা ব্যক্তি-মানুষের ধ্বংসেরই প্রতীক। তাঁর ব্যাখ্যায় 'আগুন' হচ্ছে 'কামানল'-এর প্রতীক। এই 'কামানল'কে বশে আনতে গিয়ে প্রমিথিউস ধ্বংস হয়ে গেলেন। তাঁর দেহটা শকুন আর বাজে ঠুকরে ঠুকরে খেল, পরিবর্তে মানুষ পেল সভ্যতা। তাই তাঁর মতে 'সভ্যতা' মানেই ব্যক্তি মানুষের ধ্বংস। ব্যক্তি মানুষের মুক্তি মানেই কামানলের মুক্তি। তাকে সব কিছু পুড়তে দেওয়া। এই মৌলিক তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে তদানীন্তন দুনিয়ার 'প্রায়-এক নম্বর শরীর-তত্ত্ববিদ' ঘোষণা করলেন, 'শিল্প-সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কাজ পীড়িত এবং অবদমিত মনের অভিব্যক্তি'। বলা বাহুল্য এই 'অবদমিত' মন মানে অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা। তাই তাঁর কাছে শিল্প-সাহিত্য সব কিছুই যৌনতার প্রতীক। এমনকি 'রাইমে'র 'হামটি-ডামটি' কিংবা 'বা-বা-ব্ল্যাকশিপ'ও তাঁর হাতে পড়ে যৌনতারই একটা বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ব্যাখ্যাত হয়ে গেছে। তাঁর মতাবলম্বীদের মতে অবাধ যৌনজীবনই মানব মুক্তির একমাত্র পথ। মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের প্রাথমিক শর্ত। সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের বিরোধিতা করতে গিয়ে এমনিভাবে তিনি একটা পাল্টা সংস্কৃতির আমদানি করে গেছেন। অবশ্য তাঁর আগে প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনায় কবিদের নির্বাসন দিতে চেয়েছিলেন। প্লেটোর পদাঙ্ক অনুসরণ করে শোপেনহাওয়ার— নীটৎসেও সাংস্কৃতিক জগতকে খাঁচায় বন্ধ করার পরিকল্পনা বাতলেছেন।

এরই বহিঃপ্রকাশ দেখি হিটলারের মানুষ-নিধন যজ্ঞে। সাংস্কৃতিক জগতের ওপর যে-পাশবিক অত্যাচার হিটলার নামিয়ে এনেছিল সেটা তো অদূর অতীত।

আমাদের দেশেও দেখতে পাই আর্যরা দ্রাবিড় সংস্কৃতি ধ্বংসের জন্য কী নির্মম হত্যা-ধ্বংসই না চালিয়ে গেছে। এমনকি নিজেদের মধ্যে চার্বাক নামক এক অতিকথিত মুনি যে-সংস্কৃতি প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন সেটাকে ধ্বংস করতে এবং চার্বাককে রোষে ভস্ম করতে (অর্থাৎ হত্যা) দ্বিধা করেননি। ঝর্না-ছন্দের মহাকাব্য কোরান শরিফও একাধিকবার

'উদভ্রান্ত' (বিপথের পথিক)-দের অর্থাৎ 'কবি'দের সংসর্গ ত্যাগের উপদেশ দিয়ে গেছেন। বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে ধ্বংসের জন্য আদি শঙ্করাচার্যের নির্মমতা এবং নিষ্ঠুরতা বোধহয় সব কিছুকেই ছাড়িয়ে গেছে। যে-নির্মমতা এবং নিষ্ঠুরতার সঙ্গে শঙ্করাচার্য বৌদ্ধদের ধ্বংস সাধন করেছিলেন, ইতিহাসে এখনও তার জুড়ি মেলেনি।

এ-সব থেকে বোঝা যাচ্ছে মানব জীবনে সংস্কৃতি একটা নির্ধারক বস্তু তো বটেই। না-হলে, তাকে ধ্বংসের জন্য এত তোড়জোড় এত রক্তক্ষয় কেন ঘটবে? অ্যান্টি-সংস্কৃতি দিয়ে সংস্কৃতির এই ধ্বংস সাধন কেন? এ-সব প্রশ্ন অনেক দিন ধরেই ভাবিয়ে তুলেছিল। বইপত্রের অভাবে নিছক স্মৃতির ওপর নির্ভর করে প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি। ফলে, প্রশ্নগুলো ক্রমান্বয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে: ১. সংস্কৃতি কী? ২. সংস্কৃতির উপাদানগুলোই বা কী? ৩. সংস্কৃতির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক কী? ৪. রাষ্ট্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কটা কেমন হল? ৫. সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডের বর্শামুখটা রাষ্ট্রের দিকে তাক করা উচিত? ৬. অ্যান্টি-সংস্কৃতি (আমি অপ-সংস্কৃতিটা ব্যাকরণ-অশুদ্ধ বলে মনে করি, ও-সব কোনও কথা হয় না) বনাম সংস্কৃতি। ৭. সমাজ পরিবর্তনে সংস্কৃতির ভূমিকা। ৮. সংস্কৃতি এবং সাইকোলজি। ৯. মানসিকতায় সংস্কৃতির প্রভাব ইত্যাদি। নিছক অভিজ্ঞতাপ্রসূত ধ্যান-ধারণা থেকে প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজছি। সুতরাং এটা পল্লবগ্রাহী লেখা। কোনও গবেষণাপ্রসূত নয়। তবে, গবেষকেরা এগুলো নিয়ে কাজ করতেই পারেন।

বিশেষ করে চীনের মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব যা কিনা দুনিয়াকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল— তার পর সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক জগৎটা আর বিশেষজ্ঞদের একচেটিয়া নেই। দুনিয়া-কাঁপানো সে-দিনগুলো সম্পর্কে আলোকপ্রাপ্তদের আপত্তি এখানেই। এটা একটা 'সাম্রাজ্য' তাঁরা দখল করে নিয়েছিলেন সেটাও কিনা ভেঙে গেল! সেখান থেকেও প্রশ্ন জেগেছে— একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন (মতান্তরে বিপ্লব) সে কিনা বলে, 'আমরা রাষ্ট্র ক্ষমতাটাকেই ভেঙে ফেলব।' কোথায় 'নাচন-কোঁদন' করবে, তা না, বলে ফৌজ গড়তে হবে, নয়া-সংস্কৃতিতে সংস্কৃতবান ফৌজ। এটা কি যুক্তিযুক্ত? এটা কি বাড়াবাড়ি নয়? ইতিহাসে কি এর নজির আছে? রাজবৃত্তের বাইরেকার 'নিম্নবৃত্তে'র এই সাংস্কৃতিক-বিদ্রোহ— 'রাজবৃত্তে'র হাতে পরাজিত। এখন সেখানে চলছে অ্যান্টি-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। সচেতন ক্রিয়াকাণ্ডের ওপর প্রবৃত্তির বিজয় ঘোষণার সংগ্রাম। রাষ্ট্রশক্তি সেখানেও এসে হাজির হয়েছে। প্রবৃত্তির সর্বশক্তি মত্ততার পূজারীরা রাষ্ট্রযন্ত্রটা পেতে চায়। মানুষকে মনুষ্যেতর জীবে পরিণত করার এ হেন হাতিয়ার কে না ব্যবহার করতে চায়? এতে করে তাদের লাভ? কোথায় বা তাদের শক্তির উৎস? সংস্কৃতিবান মানুষকে প্রবৃত্তিসম্পন্ন মানুষে পরিণত করার এই প্রক্রিয়া শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের ফসল। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে শোষক গোষ্ঠী যেটাকে সংস্কৃতি বলে চালাতে চায়, আসলে সেটা সংস্কৃতিই নয়। প্রবৃত্তি। বিবর্তনের ধারায় বয়ে আনা কতগুলো অচেতন ছাপ। শোষকেরা সেই আদিমতাকে নানান মোড়কে খুঁচিয়ে তুলে মানুষের সচেতন ক্রিয়াকর্ম থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে

রাখতে চায়। উদ্দেশ্য মুনাফা। এটাই একটা 'জাতি'র রাষ্ট্রের প্রচার এবং অভিভাবনের (সাজেশন) ফলে, জাতীয় সংস্কৃতির স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। আসলে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে জাতীয় সংস্কৃতি মানে মুনাফার সংস্কৃতি। শ্রেণী শোষণ এবং শাসনকে বজায় রাখবার জন্য সন্ত্রাস চালানোই এর 'মোডাস অপারেন্ডি', তাই একে 'সন্ত্রাসের সংস্কৃতি'ও বলা যায়। আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে খুন, জখম, লুঠতরাজ, ধর্ষণ আজ যে-'রূপে' দেখা যাচ্ছে, এটা তাদের সংস্কৃতি। অ্যান্টি-সংস্কৃতি।

এরই জন্য আমাদের সংস্কৃতির উৎস, বিকাশ এবং তার বিকৃতি, আর বিকৃতি থেকে নিজস্ব গৌরবময় কক্ষপথে পুনঃসংস্থাপনের কথা জানতে হবে।

এই ইতিহাস জানতে গিয়ে আমরা দেখব, সাংস্কৃতিক বিকাশের ইতিহাসও একটা রক্তক্ষয়ী ইতিহাস। সমাজ বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। সামাজিক পরিবর্তন ছাড়া সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সম্ভব নয়— এটা একপেশে ধারণা। বরং বিপরীতে আমরা দেখতে পাই, প্রত্যেকটা সামাজিক পরিবর্তনের জন্য জন-মানসের যে-মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন, গতানুগতিকতার বাইরে চিন্তা করানোর যে-প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় সে-কাজটা করেন সাংস্কৃতিক কর্মীরা। তাই বলা হয়, প্রত্যেকটা সামাজিক বিপ্লবের আগেই একটা সমাজে একটা সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটে থাকে।

এর জন্য প্রত্যেকটি সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস হল রক্তক্ষয়ী, প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার ইতিহাস, আর্থ-রাজনৈতিক পরিভাষায় শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস। তাই সংস্কৃতিকে দেখতে হবে সামাজিক রূপান্তরের গতির মধ্যে প্রক্রিয়া হিসেবে। প্রক্রিয়ার সংজ্ঞানুসারে গতি, পরিবর্তন, বিকাশ এবং রূপান্তরের মধ্যে। আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত একটা ফসল বলেই এটা আর্থ-সামাজিক নিরপেক্ষ বলে মনে হতে পারে। এক বার রূপান্তরিত হয়ে গেলে এটা নিজেই আবার সমাজ ব্যবস্থাকে তখন আমরা যেমন তার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দিয়ে চিহ্নিত করি— সংস্কৃতি দিয়েও চিহ্নিত করে থাকি। এ-সব কিছু প্রায় ছুঁয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই এ-লেখার অবতারণা। সীমাবদ্ধতা অনেক। অক্ষমতা তার থেকেও বেশি। স্মৃতি নির্ভর করে উদ্ধৃতি দেওয়ার দুঃসাহসও আছে। অনেক লেখকের নাম নেই— অথচ অজান্তে হয়ত তাঁদের ব্যবহৃত বহু সংজ্ঞা লেখায় চলে এসেছে। সংশ্লিষ্ট লেখকেরা যেন সেটাকে ঔদ্ধত্য বা 'প্লেগিয়ারিজম' বলে না-ভেবে নেন। তাঁদের কাছে তাই আগে-ভাগেই ক্ষমা চেয়ে রাখছি।

এত বিদগ্ধ পণ্ডিতজন থাকতে আমার মতো চাষাড়ে লোককে এই লেখা লিখতে হচ্ছে, এটা দুঃখের কথা। আমার কৃতিত্ব নয়।

সব শেষে সেই সমস্ত নাম-বলতে-পারা-যাবে-না বন্ধুদের কৃতজ্ঞতা জানাতেই হবে। কারণ, গোয়েন্দাবাহিনীর সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ম চোখ এড়িয়ে টুকরো টুকরো কাগজগুলো পাচার করাটা তো একটা ঝুঁকির কাজ। সেই ঝুঁকির ফসল— এটা। এটাও একটা সংস্কৃতি— ঝুঁকি নেওয়ার সংস্কৃতি। সত্যকে দৈত্যমুক্ত করার সংস্কৃতি।

# প্রথম অধ্যায়

## রূপান্তরের নিয়ম এবং সংস্কৃতি কী?

সংস্কৃতি কী? মোদ্দা কথায় শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান, বিজ্ঞানের সমষ্টিকেই কি সংস্কৃতি বলে? এগুলো হয়ত কোনও একটা সংস্কৃতির বিশেষ বিশেষ দিক। আবার একই কাজের পৌনঃপুনিক ব্যবহারকে বলা হয়ে থাকে অভ্যাস। এই অভ্যাস যখন ব্যক্তি জীবন ছাড়িয়ে ব্যাপ্তি লাভ করে সেটাই হয় আচার। অনেক সময় এই আচারকেও সংস্কৃতি বলে ভুলভাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এই বিশেষ দিকগুলো জন্মেছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং নিজের প্রজাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চালিকা শক্তিই হল ঐক্য এবং ভাঙন। প্রতিটি বস্তুকণাই পরস্পরবিরোধী শক্তির সমন্বয়। যেহেতু তারা পরস্পরবিরোধী, তাই বস্তুগুলোর সাধারণ ঝোঁকই হল ভাঙা। এই ভেঙে যাওয়ার ঝোঁকই বস্তুপুঞ্জের মধ্যে গতির সঞ্চার করে। তাই প্রকৃতিতে জড়বস্তু বলে কিছু থাকতে পারে না। পদার্থের মধ্যেকার পরস্পরবিরোধী বস্তুগুলোর এই ক্রিয়া-বিক্রিয়াই তাদের পরিবর্তন ঘটায়। তারা ভাঙে, অন্য একটা বিরোধী কণার সঙ্গে ঐকবদ্ধ হয়— নতুন বিকাশ। এখানেও শুরু হয় সেই একই খেলা। আবার ভাঙে, আবার ঐক্যবদ্ধ হয়। নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে এই খেলা— নিরবচ্ছিন্ন এই গতিতে একটা মুহূর্ত আসে যাকে বলা হয় সঙ্কট মুহূর্ত। নিরবচ্ছিন্ন গতিতে এই সময় ঘটে এক উল্লম্ফন— তৈরি হয় সম্পূর্ণ নতুন রূপান্তরিত এক বস্তু। এরই নাম বিপ্লব। বস্তুপুঞ্জের এই নিরবচ্ছিন্ন গতিতে উল্লম্ফনের নামই বিপ্লব।

প্রকৃতির জগতে এই রকম দুটো মহান বিপ্লব সঙ্ঘটিত হয়। কোটি বছরের বিবর্তনের ফসল। প্রাণহীন বস্তুপুঞ্জ (কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি) ভাঙা এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার খেলা খেলতে হঠাৎ বিকাশের রেখাচিত্রে একটা উৎক্রান্তি ঘটায়, সৃষ্টি হয় প্রোটোপ্লাজম। হাক্সলে যাকে বলেছেন 'ফিজিকাল বেসিস অফ লাইফ'। প্রাণের আধার। প্রকৃতির জগতে এটা হল প্রথম বিপ্লব। এই প্রোটোপ্লাজমও দ্বন্দ্ববিহীন নয়। এককোষী প্রাণী বিবর্তিত হতে হতে বিবর্তনের গতিপথে আবার একটা সঙ্কট মুহূর্ত দেখা যায়, আবার লেখচিত্রে ঘটে উল্লম্ফন, ঘটে প্রকৃতির মহত্তম বিপ্লব, জন্ম হয় হোমো-সেপিয়েন বা মনুষ্য-প্রজাতি।

এ-তাবৎ সৃষ্ট সমস্ত প্রাণী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। গুণগতভাবে সম্পূর্ণ নতুন এক প্রজাতি। স্তম্ভিত প্রকৃতি অবাক বিস্ময়ে দেখে নিজের সৃষ্টিকে। সৃষ্টিকে সে চ্যালেঞ্জ জানায়, 'এসো, লড়ো, লড়ে টিকে থাকো। আমার চলার নিয়মে তোমাকে জন্ম দিয়েছি বলেই যে তোমার মতো করে আমাকে নিজের থেকে নিজেকে পাল্টে নিতে হবে সেটা হচ্ছে না।' নতুন এই সৃষ্টিও প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে প্রকৃতির করাল খামখেয়ালিপনাটা লক্ষ্য করে।

বিশাল গর্জন করতে করতে সমুদ্র এগিয়ে আসছে তাকে গ্রাস করতে, সে ভীত, সন্ত্রস্ত। মাথার ওপর আগুন ঝরাচ্ছে সূর্য। গা-পুড়িয়ে দেওয়া বাষ্প। সব মিলিয়ে নতুন সৃষ্টির মধ্যে সঞ্চারিত হল একটা পরাবর্ত। নিজেকে বাঁচাবার পরাবর্ত। এই পরাবর্তই তার মধ্যে সৃষ্টি করল বিপরীত ক্রিয়া অর্থাৎ প্রজাতিকে রক্ষা করার পরাবর্ত। সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই শর্তহীনভাবে গড়ে ওঠে এই পরাবর্ত অস্তিত্ব ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয় থেকেই, শুরু হয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা। 'ভয়' হয়ে যায় এগিয়ে চলার মৌলিক চালিকা শক্তি।

শৈশবের চাপল্য কাটিয়ে নিজস্ব নিয়মেই প্রকৃতি কৈশোর অতিক্রম করতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে। যৌবনের রূপগুলো রেখায়িত হচ্ছে তার সর্বাঙ্গে। 'দিনে দিনে রূপবতী হচ্ছে সে, দিনে দিনে।' শৈশব থেকে যৌবনে উত্তরণের এই পর্যায়ে সে নিশ্চিহ্ন করে ফেলল নিজেরই খেলাঘরের কত সৃষ্টি। ধ্বংস হয়ে গেল কত প্রাণী। যে-সমস্ত প্রাণী পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেদের পরিবর্তন করে, আকৃতিতে, প্রকৃতিতে পাল্টে নিতে পারল তারাই টিকে থাকল। বৈজ্ঞানিকেরা একে বলেছেন প্রাকৃতিক নির্বাচন।

কিন্তু, তার কনিষ্ঠতম এবং মহত্তম সৃষ্টির কাছ থেকে প্রকৃতি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হল। এই হোমো-সেপিয়েন প্রজাতিটা চ্যালেঞ্জ জানাল নিজের স্রষ্টাকে। 'নাঃ বাপু! তোমার এ-সব মাজাকি চলবে না! আমার প্রজাতিকে রক্ষার জন্য আমি তোমাকে আমার মতো করে গড়ে নেব। সেগুলো করব তোমার নিয়মগুলো মেনেই।'

প্রতিকূল পরিবেশকে এ-রকমভাবে নিজের অনুকূলে গড়ে তুলতে গিয়ে মুক্ত হল তার 'হাত'। সঙ্ঘটিত হয়ে গেল তৃতীয় বিপ্লব। তাই মানুষের 'হাত' দুটো শুধু অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার যন্ত্র মাত্র নয়, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ফসলও বটে!

হাত-মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল মানুষের ইতিহাস। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে টিমটিম করে টিকে থাকা নয়, কিংবা নিজের প্রকৃতিকে পাল্টে ফেলা নয়, পরিবেশকে নিজের অনুকূলে গড়ে তোলার নামই হল ইতিহাস। এটা এক যুদ্ধ। অনিবার্যতার রাজত্ব থেকে স্বাধীনতার রাজত্বে প্রবেশের যুদ্ধ। [পরবর্তীকালে কিছু কিছু ঐতিহাসিক, টয়নবি যাঁদের মধ্যে অন্যতম, বোঝাবার চেষ্টা করেছেন পরিবেশকে মেনে খাপ খাইয়ে নেওয়াটাই নাকি মানুষের ধর্ম। মানুষের বিকাশের ইতিহাস কিন্তু তার উল্টো কথাটাই বলে। ডারউইন থেকে টয়নবি স্বতঃস্ফূর্ততার এই যে পুজো করে গেছেন তার একটা উদ্দেশ্য আছে। সেটা হল মানুষকে মানুষ নামক লোকগুলো যখন শোষণ করছেই, তখন ব্যাপক মানুষের কী আর করার আছে? সেটার সঙ্গেই খাপ খাইয়ে নেওয়া ছাড়া? এটাও একটা সংস্কৃতি। সে-প্রসঙ্গে পরে আসছি।] এই যুদ্ধে মানুষ কি নিজেকে পাল্টে নেয়নি? তার কি পরিবর্তন হয়নি? হ্যাঁ, তা-ও হয়েছে।

প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে, বিরুদ্ধ প্রাণীর বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে প্রথমেই তাকে ভাবতে হয়েছে প্রজাতির কথা। সে-ভাবনাগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে তার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেছিল। তাকে যূথবদ্ধ হতে হয়েছে। পরিবেশকে নিজের অনুকূলে গড়ে তুলতে গিয়ে,

প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের মধ্যে মানুষ নিজেকে পাল্টে ফেলল। প্রতিদিনকার সংগ্রামের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা গেল। সংগ্রামের ফলে, নিজের অঙ্গগুলোর বিকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা গেল। অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হতে শুরু করল। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের গুদামঘর তৈরি হল যার নাম মস্তিষ্ক। চিন্তার আধার। বিকশিত হল স্নায়ুযন্ত্র। নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য 'প্রাকৃতিক নির্বাচনে' টিকে থাকা প্রাণী বা বস্তুগুলোর মধ্যে কোনটা প্রয়োজনীয় সেটা সে বাছতে শিখল। 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'কে আবার 'নির্বাচনের' সামনে পড়তে হল। একটু বিশদ করা যাক। গমের গাছ প্রকৃতির অনেক প্রতিকূলতা কাটিয়ে বিবর্তিত হতে হতে টিকে থেকেছে, আবার পঙ্গপাল বা শ্বেত-শেওলাও টিকে থেকেছে। কৃষিকাজ আবিষ্কারের পর মানুষ দেখল, (অনেক ট্রায়াল অ্যান্ড এররসের মাধ্যমে, নিরীক্ষা এবং ভ্রান্তির মাধ্যমে) তার বেঁচে থাকবার জন্য গম গাছের প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু পঙ্গপাল বা শ্বেত-শেওলা গম গাছের শত্রু, তখন সে পঙ্গপাল নিধন বা শ্বেত-শেওলা ধ্বংস করার কথা ভাবতে শুরু করল। সুতরাং 'প্রাকৃতিক নির্বাচনে' টিকে থেকেছে বলেই তাদের টিকিয়ে রাখবে হবে এর বিরোধী চিন্তা দানা বাঁধতে শুরু করল। এ-রকমভাবে প্রয়োজনীয়তা এবং স্বাধীনতার সম্পর্ক স্থাপন হল। প্রয়োজন-সচেতন মানুষই হল স্বাধীন মানুষ। বলা বাহুল্য এই প্রয়োজনীয়তা সমষ্টি মানুষের প্রয়োজনীয়তা।

এ-রকমভাবেই প্রবৃত্তির জায়গা নিল সচেতনতা। গড়ে উঠল মস্তিষ্কের উচ্চতর প্রকোষ্ঠ। মানব-মস্তিষ্ক তাই কেবলমাত্র বাস্তবের বা প্রকৃতির সৃষ্টি নয়, প্রকৃতি বা বাস্তবকে পাল্টে দেওয়ার যন্ত্রও বটে।

নীরব, ক্রিয়াশীল মস্তিষ্ক যেখানে জমছে কিনা হাজার হাজার সাফল্য আর ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা, সেগুলোকে তো রেখে যেতে হবে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য! না-হলে যে প্রজাতিই ধ্বংস হয়ে যাবে। অব্যক্ত, ঠিক অব্যক্ত বলব না, ব্যক্ত করার যন্ত্রণায় ছটফটানিযুক্ত মস্তিষ্কের সোচ্চারিত হওয়ার প্রচেষ্টার ফলে গড়ে উঠল কথা-বলার যন্ত্র, শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করার জন্য বিস্তারিত চিত্র। হাতিয়ারের চিত্র। শত্রু ঘায়েলের চিত্র। বিস্তারিত চিত্রের সংক্ষিপ্ত বা বিমূর্তকরণ রূপ হিসেবে বেরিয়ে এল 'লিপি' বা অক্ষর। যেমন পায়ের গুরুত্ব বোঝাতে তারা সংরক্ষণ করল পায়ের চিত্র '।।', এটাই বিমূর্তরূপ 'L' অক্ষর। সে-সব পরের কথা। এ-রকমভাবেই শুরু হয় আজকে যেটাকে বলছি সংস্কৃতি, তার আদিরূপ।

অক্ষরের আবিষ্কারের সুদূরপ্রসারী ফল— বিশেষীকরণ বা নির্দিষ্টকরণ। কথা বলতে শিখে মানুষ প্রথম ব্যবহার করে বাক্য। অর্থাৎ সে প্রথম বলতে শেখে 'বাঘ আমাদের শত্রু'। 'বাঘ, আমাদের, বা শত্রু' কথাগুলোর বিশেষ তাৎপর্য তার কাছে তখনই ধরা পড়েনি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই 'সত্যটা' রেখে যাওয়ার জন্য চিত্রের ছবিই ছিল তার একমাত্র মাধ্যম। মস্তিষ্কের উচ্চতর প্রকোষ্ঠের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ছবিগুলো বিমূর্ত হতে

থাকে। অক্ষরের বা লিপির আবিষ্কার করে সে— সেই লিপিতেই সংরক্ষিত করার চেষ্টা করে তাদের প্রজন্মের অভিজ্ঞতা।

এই অভিজ্ঞতা বিবর্তিত হতে হতে কেবলমাত্র আর নিছক বাস্তবের ছবি থাকল না। প্রজাতি সংরক্ষণে উদ্বিয় মানুষ-প্রজন্মের টিকে থাকার জন্য পরিকল্পনাগুলোও সংরক্ষণ করে গেল। অর্থাৎ পৃথিবীটা যেমন কেবলমাত্র তেমনটাই তুলে ধরাটাতেই সে সন্তুষ্ট থাকল না, কেমন হলে ভাল হয়, কেমনটা হওয়া উচিত সেটাও তুলে ধরতে শুরু করল। কল্পনা, হাইপোথেসিস, এ-সবের জন্ম রহস্য এখানেই। আর এ-সবই তো তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামের ফলশ্রুতি। এটাই তো সংস্কৃতি।

তা হলে সংস্কৃতি কী? সংস্কৃতিকে আজকাল যে কেবলমাত্র 'সমাজদেহের লাবণ্য ছটা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, আসলে সংস্কৃতি ব্যাপারটা মোটেই কেবলমাত্র লাবণ্য ছটা নয়, সমাজের রূপ। প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে রক্ত-ঘাম-কান্নার বিনিময়ে অর্জিত অভিজ্ঞতার সারসঙ্কলন। বিভিন্ন জনসমষ্টির অভিজ্ঞতা ভিন্ন, তাই সংস্কৃতিও ভিন্ন হতে বাধ্য। তার কোনও সর্বজনীন রূপ নেই এটা যেমন সত্য, তেমনই সত্য সমগ্র প্রজাতিটাকে টিকিয়ে রাখা এবং বিকাশ করার ফল বলে সব সংস্কৃতিরই (যদি সেটা আদপেই সংস্কৃতি হয়) একটা সাদৃশ্য আছে।

## সংস্কৃতির তিন উপাদান

তা হলে দেখা যাচ্ছে প্রকৃতিতে প্রাণময় জীবদের মধ্যে একমাত্র মনুষ্য-প্রজাতির মধ্যেই সংস্কৃতি নামক বস্তুটার অস্তিত্ব আছে। বাঙ্ময় এই প্রজাতিই নিজেকে তুলে ধরতে পারে। নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করতে পারে। অন্যান্য প্রাণী যেখানে বেঁচে থাকার জন্য প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার ওপর নির্ভরশীল অর্থাৎ ইকোলজি (Ecology) নির্ভর, মানুষের ক্ষেত্রে এই 'ইকোলজি'র জায়গা নিয়েছে ইকনমিকস। প্রবৃত্তির ওপর স্থান গ্রহণ করেছে সচেতনতা। পরিবেশকে নিজের মতো গড়ে নেওয়ার মানসিকতা। এরই ফল সংস্কৃতি। স্বতঃস্ফূর্ততার জায়গা নিয়েছে পরিকল্পনামাফিক কল্পনা। এ-রকমভাবে সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে অনবরত যুদ্ধরত মানুষের কিছুক্ষণের জন্য দম নেওয়ারও ক্ষেত্র। পরবর্তী যুদ্ধ ঘোষণার জন্য রসদ সংগ্রহের ক্ষেত্র। এক কথায়, মানুষের সাংস্কৃতিক কাজকর্মের উপাদান তিনটি: ১. মানুষ নিজে, ২. তার অর্থনৈতিক কার্যক্রম অর্থাৎ উৎপাদনী সংগ্রাম, ৩. এরই জন্য প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম।

মানুষের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডকে বুঝতে গেলে এই তিনটি উপাদানকে সামগ্রিকভাবে বুঝতে হবে তাদের আত্মসম্পর্ক দিয়ে, তাদের মধ্যকার ঐক্য এবং বিভেদ দিয়ে। কোনও একটার ওপর বেশি জোর দিলে, বা কোনও একটাকে 'একমাত্র' ভেবে নিলে ব্যাপারটা 'অন্ধের হস্তীদর্শন'-এর মতো হবে। হতে বাধ্য। কখনও মনে হবে 'হাতি দেখতে' নিশ্চয় থামের মতো। কখনও বা কুলোর মতো, কখনও আবার মুলোর মতো মনে হতে পারে।

# মানুষ

প্রাণহীন বস্তুপুঞ্জের ভাঙাগড়ার প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই প্রাণের বস্তুগত উপাদান প্রোটোপ্লাজমের সৃষ্টি। তা হলে 'প্রাণটা' কী? জটিল বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম তার সরলতম উপাদানে বিভাজন হওয়া (simplest form)। প্রাণময় জটিল বস্তুটার এই ভেঙে যাওয়ার ঝোঁককে ঠেকিয়ে রাখে যে-শক্তি বা 'বন্ডেজ', সাহিত্য করে বললে, বলতে পারা যায়— তারই নাম প্রাণ। এটা সম্পূর্ণ বস্তুগত শক্তি। আমরা আগেই সংক্ষেপে দেখেছি এককোষী প্রাণী থেকে বিবর্তনের পথে— অর্থাৎ বিবর্তনের গতিপথে একটা সঙ্কটকালীন মুহূর্তে হঠাৎ ছেদ-বা উৎক্রান্তির ফলেই হোমো-সেপিয়েন বা মনুষ্য-প্রজাতির আবির্ভাব। সেদিনকার সেই অস্তিত্ব ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয়ে ভীত মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামের ফলেই আজকের বিকশিত মানুষের জন্ম। এরই জন্য ঘুরিয়ে বললে বলতে পারি 'ভয়'টা সহজাত। তাই বার বার বলতে হয়— 'সাহস' অর্জন করতে হয়। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে ব্যাখ্যা করে একটু অতি-সরল করে বলতে পারি— 'ভয়ে'র এই পরাবর্তই মনুষ্যসভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে চালিকাশক্তির কাজ করেছিল। এরই ফলে প্রজাতি-সংরক্ষণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির সংগ্রাম, পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে প্রতিকূলতায় বিরোধিতা করার মানসিকতার জন্ম। তারই পরিশীলিত রূপ— আজকের (যেগুলোকে বলি) স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালবাসা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি। আধুনিক কালের দার্শনিক-কবি যেমনটা বলেছেন আর কি! 'সন্দেহ ভালবাসারই প্রমাণ'। অর্থাৎ তিনি 'ভয়ে'রই রকমফেরকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। কত রকমেরই না তার রূপ। যার সম্পদ আছে সম্পদ হারাবার ভয়, যার নেই তার সম্পদের অভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয় (এরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে সাহসের সঙ্গে সম্পর্ক অর্জনের প্রচেষ্টা), 'সম্মান' থাকলে সেটা হারানোর ভয়, না-থাকলে তার অভাবে হেনস্থা হওয়ার ভয়... ইত্যাদি। অর্থাৎ ডেসডিমোনাকে প্রতীক হিসেবে ধরে নিলে আমরা সকলেই এক একজন ওথেলো! মানসিকভাবে ভয়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ জীব! যৌন-জীবনও প্রজাতি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয়েরই ফসল।

সমস্ত মানুষের মধ্যে এই সাধারণ দিকগুলো থাকে আর এগুলো দেখেই মানুষের ধারণা জন্মায়— 'মানুষ' ক্লাসিকাল জীব। নির্ধারিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রাণী। 'ঠাকুর' রামকৃষ্ণ তাই বললেন— 'টিয়াকে যতই কৃষ্ণ কৃষ্ণ শেখাও না কেন, বিড়াল ধরলে তার মুখ দিয়ে ট্যা, ট্যা শব্দই বার হবে।' তিনি মানুষের পূর্ব-নির্ধারিত, চিরায়ত বা শাশ্বত চরিত্রটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। আধুনিককালে কিছু কিছু সাংস্কৃতিক কর্মী— 'দর্শনের ঝকমারি' এড়াতে গিয়ে রামকেষ্টদেব হয়ে পড়েছেন।

সংক্ষেপে হলেও আমরা আগেই দেখিয়েছি— মানুষ ক্লাসিকাল জীব নয়, রোমান্টিক জীব, পৃথিবীটা যেমন তেমনটাতেই সে সন্তুষ্ট নয়। তার যূথবদ্ধতা আর পিঁপড়ের যূথবদ্ধতার মধ্যে ফারাক আছে। রামকেষ্টদেবের টিয়ার সঙ্গেও তার ফারাক আছে। তার যৌন-জীবনও নিছক প্রবৃত্তি নয়— সেটাকেও সে মহিমান্বিত করেছে। অর্থাৎ সে হল ভাস্ট-রিজার্ভার অফ পটেনশিয়ালিটি।

মানুষের মধ্যকার এই সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে পারে মানুষই— তাদের সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড দিয়ে। তা হলে দেখা যাচ্ছে— মানুষের মধ্যেই দুটো দিক আছে। একটা বিবর্তনের ধারায় নিয়ে আসা 'আদিম' দিক। আর একটা অর্জিত। প্রকৃতি এবং পরিবেশকে নিজের অনুকূলে গড়তে গিয়ে অর্জন করা। প্রথমটা চাপা পড়ে গেছে। কিন্তু মুছে যায়নি।

প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে, তাকে শত্রুর বিরুদ্ধে নির্মম, কখনও কখনও বা নিষ্ঠুর হতে হয়েছে, শত্রুকে এড়িয়ে যেতে গিয়ে, কিংবা ভুলিয়ে (যেমন পশুর ডাক ডেকে, পশুকে ডেকে আনা) তাকে ফাঁদে ফেলতে হয়েছে, পরবর্তীকালে, খাদ্যের অভাব দেখা গেলে— নিজের প্রজাতিরই অন্যকে বঞ্চিত করতে হয়েছে, কিংবা যুদ্ধ করে ভিন্ন গোষ্ঠীর সদস্যকে বন্দী করে এনে, (প্রথমে খেয়ে ফেলত) তার শ্রম চুরি করতে হয়েছে, নিজেদের গোষ্ঠীর জনসংখ্যা বাড়ানোর তাগিদে, নারীকে সম্পদ হিসাবে (ভোগ্য নয়) ভাবতে বাধ্য হয়ে— নারীর ওপর দখলদারিকে কেন্দ্র করে, জোর জবরদস্তি করতে হয়েছে।

এমনিভাবেই, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম এবং বিকাশের সংগ্রামের সদর্থক প্রচেষ্টার বিপরীতে গড়ে উঠেছে, নিষ্ঠুরতা, শঠতা, প্রবঞ্চনা, শোষণ, যৌন-কাতরতা, ঈর্ষা, অর্থাৎ সহজাত সহযোগিতা, ভালবাসা, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ের 'থিসিস'ই তার মধ্যে জন্ম দিল অ্যান্টি-থিসিস, প্রবৃত্তিতাড়িত মানুষের মধ্যে নঙর্থক এই অ্যান্টিথিসিসের প্রভাব বেশি, যেমন অবিকশিত বা বিকাশোন্মুখ, শিশু কিংবা কিশোরের মধ্যে নঙর্থক-ব্যাপারগুলো আয়ত্ত করার স্বাভাবিক ঝোঁক দেখা যায়। বাবা-মায়েদের এইগুলো নিয়ে কতই না দুশ্চিন্তা!

এই 'থিসিস', 'অ্যান্টি থিসিসে'র সংগ্রামই— একটা মানুষের মনস্তত্ত্ব। তা হলে মনস্তত্ত্ব = (যূথবদ্ধতা+ পারস্পরিক নির্ভরতা+ভালবাসা+ এবং প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম) বনাম (প্রবঞ্চনা+ঈর্ষা+নিষ্ঠুরতা+যৌনকাতরতার জন্য সংগ্রাম)= সচেতন-সদর্থক অভিজ্ঞতা বনাম আদিম-বিবর্তনের ধারা থেকে নিয়ে আসা পশু-প্রবৃত্তি।

সংস্কৃতি বস্তুটা যেহেতু মানুষের মধ্যেই থাকে, তাই মানুষের এই মনস্তত্ত্ব বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো তার সাংস্কৃতিক কাজকর্মে ফুটে ওঠে। এরকমভাবেই সৃষ্টি হয়— সংস্কৃতি বনাম অ্যান্টি-সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব। সচেতন সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড বনাম আদিম-পাশবিক প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব। সমাজ শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ার পর তাই সাংস্কৃতিক জগতের দ্বন্দ্বগুলোও শ্রেণী রূপ নেয়। অর্থাৎ প্রচলিত পরিবেশ এবং অবস্থাকে চিরায়ত বলে চিহ্নিত করার ঝোঁক দেখা যায়। নঙর্থক প্রভাবগুলোকে বার বার উত্তেজিত করে— সদর্থক চরিত্রকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। উদ্দেশ্য? প্রচলিত ব্যবস্থাটাকে মেনে নিতে বাধ্য করা। শিল্প, সাহিত্য, দর্শন এমনকি বিজ্ঞানকেও এই কাজে ব্যবহার করা হয়। এক কথায় মানসিক জগত বা সাংস্কৃতিক জগতে প্রবৃত্তির সর্বশক্তিমত্ততাকে তুলে ধরার জন্য মানুষ ক্লাসিক, তার ভবিষ্যৎ পূর্ব-নির্ধারিত, চরিত্র অনড়-অটল, এটাকেই তুলে ধরে— এ্যাসথেটিক বা নন্দনতত্ত্ব বলে চালানো হয়। বলা হয়— এটাই সংস্কৃতির মুখ্য এবং একমাত্র দিক।

অর্থাৎ মানুষকে নামিয়ে আনা হয়— তার আদিমতম যুগের-নঙর্থক-প্রভাবে প্রভাবিত যুগে। অ্যান্টি-থিসিসটাই হয়ে দাঁড়ায় থিসিস। অ্যান্টি-কালচারটাকেই বলা হয় কালচার!

বিপরীতে এগুলো দেখলেই সেটাকে অস্পৃশ্য করে তোলার চিন্তাটাও দানা বাঁধে।

## উৎপাদনী সংগ্রাম এবং পরিবেশ-প্রকৃতি

সমাজবিজ্ঞান কিংবা ইতিহাসের বই খুললেই প্রায়শই আমাদের চোখে পড়ে— প্রস্তরযুগের সভ্যতা, দাস সভ্যতা, কৃষি-কর্মযুগের সভ্যতা, যন্ত্র-সভ্যতা ইত্যাদি কথাগুলো। অর্থাৎ একটা বিশেষ যুগের, বিশেষ অঞ্চলের সংস্কৃতিকে বোঝাতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা সেই যুগের মানুষ যে-যে হাতিয়ার বা উপকরণগুলোর সাহায্যে নিজেদের বিকাশসাধন করেছিল— সেইগুলো দিয়ে সেই সমস্ত যুগ বা যুগের অর্থনৈতিক-ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ব্যাপারটা গোপাল হালদার ম'শায়কে উদ্ধৃত করে বলা যায়— 'ফুল দেখে গাছকে চিহ্নিতকরণ'— দূর থেকে দেখলে আগে ফুলটাই চোখে পড়ে। গোটা গাছটাকেই যদি একটা যুগ বলে ভেবে নিই তাহ'লে মূলটা হল অর্থনীতি, কাণ্ডটা সমাজব্যবস্থা, বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় প্রস্ফুটিত ফুলগুলো হল তার সংস্কৃতি বা সভ্যতা। মূল না থাকলে ফুলের কথা ভাবা যায় না। অর্থাৎ সামাজিক-মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য অর্থনৈতিক কাজকর্মই তার সভ্যতা বা সংস্কৃতির প্রধান উৎস।

এরই জন্য সংস্কৃতির বিকাশের ইতিহাস এক অর্থে উৎপাদন-উপকরণগুলোরও ক্রমবিকাশের ইতিহাস। অনবরত সেগুলোকে উন্নত থেকে উন্নততর পর্যায়ে তোলার ইতিহাস। সেগুলোর ওপর দখলদারির ইতিহাস। শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার ম'শায় যতই বলুন না কেন, রক্তপাত ছাড়া উৎপাদন-উপকরণের বিকাশসাধন কখনও হয়নি, আর ভবিষ্যতে তো হবেই না! রক্তপাতহীন-বিশ্ব-মানব-সংস্কৃতির, যে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন তিনি দেখেছেন—সেটা শুনতে ভাল, ভাবতে আরও ভাল লাগে, কিন্তু ''ভাল-লাগা'' আর বাস্তবে একটু ফারাক আছে—আর সেই ফারাকটাই তৈরি করেছে অ্যান্টি-সংস্কৃতি। যার বহিঃপ্রকাশ:— আত্মসাৎ, প্রভুত্ব, শঠতা। সঠিকতা জেনেও না-বলা! যাক্ সে সব বিতর্ক। সে-সবের জন্য অনেক বিদগ্ধজনের হাত উসখুস করছে। তাঁরা কলমের ঠাকনা খুলে অপেক্ষা করছেন। সেগুলো তাঁরাই করবেন।

আমি যা বলতে চেয়েছি তা হল— বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষকে দুটো সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে পড়তে হল—

১। মানুষ মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত হল।

২। মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত হল।

মানুষের এই মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে পড়ার নামই সমাজ। এই সমাজ প্রথম দিকে ছিল আলগা। যাযাবর বৃত্তির ওপর নির্ভর করে তাকে নিজের খাদ্য সংগ্রহ করতে হত। অর্থাৎ প্রকৃতি যা দিয়েছে, যেমনটা পাওয়া যায় সেটা সংগ্রহ করে টিকে থাকা। এরই জন্যই যতটুকু এক-হওয়া প্রয়োজন—ঐক্যবদ্ধ হওয়া। সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির দয়া-নির্ভর হয়ে বেঁচে থাকার এই যুগে তাই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেল না। এই যুগে সমাজের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে দায়বদ্ধ, স্ব-আরোপিত শৃঙ্খলায় শৃঙ্খলিত ছিল। কিন্তু এই দায়বদ্ধতার পেছনে না-ছিল কোনও সচেতনতার ছাপ, না-ছিল সচেতন উদ্দেশ্য। সম্ভবও ছিল না। এটা ছিল প্রাকৃতিক তাড়নায় গড়ে ওঠা এক যূথবদ্ধতা।

কিন্তু এই যুগের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল— শ্রমের প্রাকৃতিক বিভাজন। সুন্দর-অসুন্দর, মঙ্গল-অমঙ্গল সম্বন্ধে প্রাথমিক ছাপ এই যুগেই মানুষের মস্তিষ্কে পড়ে। শারীরিক কারণেই মানবীকে দীর্ঘ সময় আবদ্ধ থাকতে হয় আবাসন স্থলে। বংশরক্ষার স্বাভাবিক তাড়নার ফলে আসাবন রক্ষণাবেক্ষণ মানবীর নিজস্ব বিভাগ হয়ে দাঁড়াল। এই সময় সে নানান ভ্রান্তি এবং নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগুলোকে চিনতে শেখে। ব্যাখ্যা পায় না।

ঋতুস্রাবের সঙ্গে পেটে সন্তান আবির্ভাবের ব্যাপারটা জানতে পারে কিন্তু বোঝে না। ফলে রক্তের সম্পর্কে তার একটা সংস্কার গড়ে ওঠে। সঙ্গে লাল রঙের প্রতি মমতা এবং দুর্বলতা। পাকা যব তার সন্তান- সন্ততিকে বাঁচিয়ে রাখে, বার্লি অনিবার্য। তাই যবের রঙটাও তার ভাল লাগল। অর্থাৎ তখনকার কোনও মানবীকে যদি কবিতা লিখতে হত তিনি নিশ্চয়ই 'সোনালী রঙের যব' না লিখে 'পাকা যবের রঙের ধাতব' খণ্ড বলে সোনার বর্ণনা দিতেন।

এককথায়: বেঁচে থাকার জন্য (সামাজিক অস্তিত্ব এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য) যা কিছু প্রয়োজন তাই সুন্দর, আর সেই সমস্ত বস্তুগুলোর গুণাবলিও সুন্দর। এরকমভাবেই— বস্তুনির্ভর গুণ হিসাবেই—'সুন্দর'-এর সৃষ্টি। এবং এর স্রষ্টা মানব নয়, মানবী। সে-দিনের 'সুন্দর' এবং সৌন্দর্য একান্তই বস্তুনির্ভরই। সে-দিনের সেই জানা থেকেই আজ বস্তু-নিরপেক্ষ সৌন্দর্যের জন্ম। এই বিমূর্তীকরণ এসেছে মানব-সভ্যতা বিকাশের একটা পর্যায়ে। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামই তাকে— অস্তিত্ব-নিরপেক্ষ গুণাবলির খোঁজে ঠেলে দিয়েছে। তাই সৌন্দর্য বোধের সঙ্গে প্রয়োজনীয়তা কথাটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কিন্তু এটাই কি সব বলা হল? না। সুন্দর জিনিস, সুন্দর রঙ, সুন্দর দৃশ্য, এগুলো শর্তহীনভাবে মানুষের মধ্যে গড়ে তোলে পরাবর্ত। শর্তহীন পরাবর্ত। 'জিনিস', 'রঙ', 'দৃশ্য' (বিশেষ্যগুলোকে বাদ দিয়ে)

‘গুণ’গুলো নিজেরাই একটা ধারণার জন্ম দেয়। ‘গুণ’গুলোর এক একটা বিশেষ্য আছে বলেই কবি বলতে পারেন—‘‘আ থিং অব বিউটি ইজ্ জয় ফর এভার!’’ সৌন্দর্যবোধ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হিসাবে চিহ্নিত হয় যায়।

ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা একটু আধুনিককালে প্রবেশ করতে পারি: বিড়লার ছেলে, আমার কবি-বন্ধু, আর হা-ভাতে আমি, তিনজনেই টাইগার হিলে গিয়ে সূর্য ওঠা দেখলাম। সূর্যটা রঙের মোহ সৃষ্টি করে উঠছে— রঙ ছড়াচ্ছে, রঙ পাল্টাচ্ছে, রঙ ধরাচ্ছে! কট্টর পরিবেশপন্থী বাসুদেব, অভিভাবনের (সাজেশন) এই খেলা সম্পর্কে খুব সচেতন। সেই তো আমাদের নিয়ে গিয়েছিল! সে আমাদের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। সে আবাক হয়ে দেখল— আমরা তিনজনেই একই সঙ্গে বললাম, ‘ব্বা! কী সুন্দর’! ‘হোয়াট-আ-নাইস!’ ‘কেয়া বাৎ!’’ কলা-কৈবল্যবাদী কেউ একজন আমাকে প্রশ্নবাণে জর্জর করার জন্য জিবে শান দিচ্ছেন:— ‘এই যে! হক সাহেব! তা, টাইগার হিলের এই রঙের সঙ্গে আপনার বস্তু-নির্ভর সৌন্দর্যের সাদৃশ্য কোথায়? এটা কেন সুন্দর হল? তা হলে সৌন্দর্য জিনিসটা কি সম্পূর্ণ হার্দিক-মানবিক ব্যাপার নয়?’ বিপরীতে এক অতি-আধুনিক প্রগতিবাদী ধিক্কার জানাল: (যদিও সে নিজেও সেই সময়টুকু স্পেল-বাউন্ড ছিল!) ‘ছিঃ ছিঃ আজিজুলদা! আপনার এই অধঃপতন। এই বুর্জোয়া ‘বিলাসী সৌন্দর্য-মায়ায় ভুললেন!’ তাকে জিজ্ঞাসা করলাম— ‘সত্যি কথা বলো তো বাপু! তোমার ভাল লাগেনি?’’ সে মাথা নিচু করে বললে— হ্যাঁ, কারণ আমিও তো ... পেটি...’ বললাম— ‘চুপ করো।’ কলা-কৈবল্যবাদীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বিড়লার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলাম— ‘আচ্ছা আপনার কাছে এই সূর্য ওঠাটা কেমন সুন্দর?’ সে বলল— ‘সোনা, সোনা, গোটা অঞ্চলটা হীরে, মুক্ত, পান্না, চুনী দিয়ে মোড়া সোনা...’ কবিকে জিজ্ঞাসা করলাম— ‘কেমন সুন্দর?’ সে বলল— ‘ওয়ার্ডসওয়ার্থ ছাড়া এ বর্ণনা কেউ করতে পারবে না।’ বললাম, ‘তবু বলো!’ ‘আমার প্রিয়ার মুখের মতো!’ এবার আমার পালা, সিরিয়াসলি বলছি— ‘সূর্যটা যখন স্থির হবো হবো করছে তখন আমার মনে হল— গনগনে ঘুঁটের আঁচে আধা সোনালি ভুট্টার গোলা রুটিটা’! কলা-কৈবল্যবাদী চুপ করে গেলেন। বুঝলেন তাঁদের ভাঁওতাটা কোথায়! বিবর্তনের একই ধারা বেয়ে আসার জন্য আমাদের তিনজনের মধ্যেই প্রয়োজন-নির্ভর-সৌন্দর্যের ধারণাটা রয়ে গেছে। পরিশীলিত মন সেটাকেই নির্বস্তু সুন্দর হিসাবে গ্রহণ করেছে। সেটাই আমাদের ক্লাসিক্যাল দিক। এখানে মানুষ শ্রেণী-জাতি-বর্ণের ঊর্ধ্বে। প্রজাতির অংশ। আবার আমাদের উচ্চতর মন (মস্তিষ্ক) আর্থ-সামাজিক-অবস্থার দ্বারা সীমাবদ্ধ। বিশ্লেষণে সে নিজের আকাঙ্ক্ষাকেই তুলে ধরে। এমনকি রূপ-চর্চারও আদি ইতিহাস প্রয়োজন থেকেই

এসেছে। সূর্যের গা-পোড়ানো-তাপ থেকে বাঁচার জন্য গাছ-গাছালির পাতা বা মূলের রসের ব্যবহার থেকেই যে আজকের এত স্কিন-লোশন, এটা তো ইতিহাস। বাচ্চাটাকে স্বাস্থ্যবান করে গড়ে তোলার জন্য বাসস্থানটাকে ভাল করার আকাঙ্ক্ষা— আদিম মায়েরই চিন্তা। এগুলো সবই— সেই যুগের সংস্কৃতি চর্চা। সবই পরিশ্রমের অভিজ্ঞতা। মোদ্দা কথায়— যা-কিছু আমার প্রজাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এবং বংশবিস্তার করতে সাহায্য করে— সে-সবই সুন্দর, সে-সবই সত্য, সে-সবই শিব। সে-সব কিছুই যত্ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ দাবি করে। আগেই বলেছি— বিবর্তনের ধারায় মস্তিষ্কের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সাধারণীকরণ করতে শিখল, গুণকে বিশেষ বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করতে শিখল। ফলে 'গুণে'র প্রয়োগের ক্ষেত্র অনেক বেড়ে গেল। নির্গুণ বস্তু বা বস্তু-নিরপেক্ষ-গুণ তাই বাস্তবে অসম্ভব। যদিও এটার বিমূর্ত রূপ বেশির ভাগ সময়ই বস্তু-নিরপেক্ষ বলে মনে হতে পারে।

বেঁচে থাকার জন্য, জীবনের স্ব-পক্ষে লড়তে গিয়ে তাকে বিকশিত করতে গিয়ে— এইরকমভাবেই গড়ে উঠেছে সৌন্দর্যবোধ।— শ্রমের ফসল। শ্রম-নিরপেক্ষ অলস-মস্তিষ্কে জাত নয় এটা।

তাই যা কিছু তার হাতিয়ার যেগুলোর আঙ্গিক (বাহ্যিক) এবং অভ্যন্তরীণ বিকাশ সাধন মানুষের কাজের তালিকায় প্রয়োজনীয় স্থান দখল করে নিল। শুধু তাই নয়— তার মানসিকতাকে নির্ধারণ করার একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে গেল। এখন সে পরিবেশ, প্রকৃতি, বা তার চার পাশের মানুষজন যেমন, তেমনটাতেই আর সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। 'যেমনটা হওয়া উচিত', 'যেমনটা হলে আরও অনুকূল পরিবেশে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের টিকে থাকা সুবিধা হবে'— সেইরকম ভাবতে শুরু করল। তার মানে যে সংগ্রাম (আধুনিক পরিভাষায়— অর্থনৈতিক) থেকে তার মানসিকতা গড়ে উঠেছে, সেই মানসিকতা সেই মূর্ত সংগ্রাম নিরপেক্ষ হয়ে— সংগ্রামের গতিপথ নির্ধারণ করতে শুরু করল। তাই 'সংস্কৃতি' যেমন অর্থনৈতিক অবস্থাজাত তেমনি একবার জন্ম হয়ে গেলে— সে অর্থনৈতিক অবস্থাকে পাল্টানোর অন্যতম হাতিয়ারও বটে। অর্থাৎ 'সংস্কৃতি' শুধু অর্থনৈতিক অবস্থার ফসল নয়, নতুন অর্থনৈতিক-ব্যবস্থা গড়ার রূপকারও বটে। সে-সব প্রশ্নে আবার পরে আসা যাবে। ফলে নিজের অস্তিত্ব দিয়ে (জন্ম-বৃদ্ধি-মৃত্যু) সে প্রকৃতির ব্যাখ্যা খুঁজতে শুরু করল, বা প্রকৃতির কাজ-কর্ম দিয়ে নিজের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা বুঝতে চেষ্টা করল, পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে চেষ্টা করল। এত সব ব্যাখ্যা খুঁজে বার করার মতো তার না ছিল অবসর, না ছিল কলা-কৌশলগত-উৎকর্ষতা, ফলত 'জাদু-বাদ' সে-যুগের দর্শন-বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায়। এটাই যে ছিল সে যুগের সংস্কৃতি।

তারপর এসেছে প্রস্তর যুগের সভ্যতা, পশুচারণ যুগের সভ্যতা, কৃষি যুগের সভ্যতা, যন্ত্র-যুগের সভ্যতা। বলার অপেক্ষা রাখে না এখানে সভ্যতা এবং সংস্কৃতি সমার্থক। অর্থাৎ উৎপাদনী সংগ্রামের হাতিয়ার সমূহের বিকাশের ইতিহাসই সংস্কৃতির ইতিহাস।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## সমাজ ও সংস্কৃতি

হোমো-সেপিয়ান বা মস্তিষ্কওয়ালা মানুষের আবির্ভাবের আগে দীর্ঘদিন মানুষ ছিল হোমিলিডস বা নর-বানর। নর-বানর স্তর থেকে সজ্ঞান-মানুষে রূপান্তরের পরেই মানুষের সত্যিকারের ইতিহাস শুরু হল। কারণ তখন সে তার হাতকে মুক্ত করতে শিখেছে। হাতিয়ার ব্যবহার করতে শিখেছে। নিজেদের মধ্যে একটা সম্পর্কও স্থাপন হয়েছে। ইতিহাসের আদিম যুগের নাম প্রস্তর যুগ। প্রস্তর যুগের আবার নানান ভাগ। আদিম প্রস্তর যুগ, মধ্য প্রস্তর যুগ, নব্য প্রস্তর যুগ। পাঁচ লক্ষ বছর আগে এই যুগের অস্তিত্ব ছিল। বেঁচে থাকার প্রধান উপাদান খাদ্য ছিল বড় অনিশ্চিত। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা জুটত সেটাই সকলে মিলে ভাগ করে খেত। কোনও কোনও দল শিকারের কৌশল আয়ত্ত করে। কাজেই মানুষে মানুষে সম্পর্ক ছিল জীবিকা-প্রধান। দলবদ্ধভাবে জীবনযাপনই ছিল প্রধান মানসিক গঠন। 'নিজের দলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে পরিশ্রম এবং সকলের সঙ্গে মিলেমিশে সে পরিশ্রমের ফসল ভাগ করে নেওয়া'— এই ছিল সামাজিক বণ্টন ব্যবস্থা এবং মানসিক গঠন। তাই মানুষে মানুষে সম্পর্ক ছিল সরল, অকৃত্রিম। মানুষ এবং প্রকৃতিতেও তাই। মনুষ্য-নিরপেক্ষভাবে বিদ্যমান প্রকৃতির ওপর সজ্ঞানতা এবং জীবন আরোপ করেই— প্রকৃতির ব্যাখ্যা এবং নিজের উৎসের ব্যাখ্যা ভাবতে শুরু করে। নিজের সঙ্গে বহির্বিশ্বের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য অতিপ্রাকৃতিক বস্তুর আমদানি বা 'আত্মার' চিন্তা এই সময় দানা বাঁধেনি। নিজেকে ভাবতে থাকে প্রকৃতিতে বিদ্যমান জীব বা প্রাণিজাত। কোনও একটা প্রাণী কিংবা উদ্ভিদকে নিজেদের আদি-পিতা ভেবে নেয়। অর্থাৎ, সামাজিক-বণ্টন ব্যবস্থার মতোই আদিম মানুষের সাংস্কৃতিক জগৎটা ছিল একেবারে যৌথ, বস্তুতান্ত্রিক। প্রয়োজনের তাগিদ-সর্বস্ব। এই বস্তুতান্ত্রিকতা বলাবাহুল্য— স্থূল! শ্রমের ফসল থেকে তখনও তার বিযুক্তি ঘটেনি। ফলে ব্যক্তি-মানুষেরও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা আসেনি। সংস্কৃতির জগতেও তাই— গড়ে উঠেছিল সমন্বয়ের এবং পারস্পরিক সহযোগিতার প্রগতির পথ অন্বেষণ। কল্পনার দৌড়— নিজের চারপাশকে ঘিরেই।

এরপর নব্য প্রস্তর যুগে হাতিয়ার উন্নত হল। নৃতত্ত্ববিদরা বলেন, এটা দশ-পনেরো হাজার বছর পূর্বের ঘটনা। এই যুগের মূল হাতিয়ার হিসাবে কুঠার আর তীরের আবির্ভাব। এই যুগের প্রারম্ভে কিংবা আগের যুগের (মধ্য প্রস্তর যুগের একেবারে শেষে) শেষার্ধেই মানুষ আগুনের ব্যবহার শেখে। আগুনের আবিষ্কার এবং তার ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন— সংস্কৃতির জগতে একটা ঘটনা তো বটেই। বিভিন্ন গোষ্ঠীর আগুনের ব্যবহারের ওপর কর্তৃত্ব করার চেষ্টা এবং সেটা ভেঙে ফেলার চেষ্টার রেশ টেনেই কি প্রমিথিউস-এর উপকথার জন্ম? তাহলে ধরে নিতেই হবে উৎপাদনের হাতিয়ারের ওপর অধিকার নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে তখনই। অবশ্যই এই 'অধিকার' বা দখলদারি তখনও 'গোষ্ঠী' অধিকার। ব্যক্তিগতভাবে অধিকার করার চিন্তা তখনও আসেনি। অর্থাৎ সমাজ ক্রমশ জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করছে। মানুষ আয়ত্ত করতে শিখল— পশুপালন এবং কৃষিকাজ। একটা ধারণা এখানে একটু পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত— অনেক সমাজ-বিজ্ঞানীই মনে করে থাকেন মানব সভ্যতার বিকাশ একই খাতে পর্যায়ক্রমে, পরপর হয়েছে। অর্থাৎ— প্রস্তর যুগ— পশুপালন যুগ (বা যাযাবর বৃত্তির যুগ)— তারপরে কৃষি যুগ।

কিন্তু ইদানীংকালের আবিষ্কারগুলো থেকে জানা যাচ্ছে— বিশেষত কোনও কোনও অঞ্চলে কৃষিজাত বা সভ্যতার পরে (যাযাবরের আক্রমণেই হোক কিংবা তাদের সঙ্গে লেনদেনের মাধ্যমেই হোক— যাযাবরের সভ্যতার যুগ বা অনুপ্রবেশ ঘটেছে) পশুপালন যুগ শুরু হয়েছে। কোথাও বা পশুপালনের তাগিদে পরিপূরকভাবে কৃষি-যুগের সূচনা হয়েছে। ব্যাপারটা মোটেই আগের বা পরের ব্যাপার নয়। ঘটেছে এলাকার আবহাওয়া, সামাজিক-বিন্যাস এবং উৎপাদনের হাতিয়ারের বিকাশের ওপর নির্ভর করেই।

যা-ই হোক, পশুপালন এবং কৃষিকাজ, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধাতুর ব্যবহার— এতদিনকার সরল-সামাজিক কাঠামোতে একটা পরিবর্তন এনে ফেলল। দেখা দিল সামাজিক-শ্রম বিভাগ। একদল পশুচারণ করবে, সেই গোষ্ঠীরই অন্য একদল খাদ্য সংগ্রহ করবে, পশুগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করবে, ধাতুর আবিষ্কার এবং ব্যবহার-বিশেষজ্ঞ হিসাবে একদলকে তৈরি করল। এতদিন ছিল প্রাকৃতিক শ্রম-বিভাজন, নারী পুরুষের কাজের ভাগ। এখন তার জায়গা নিল কৃত্রিম শ্রম-বিভাজন। পেশার উৎপত্তি।

এই শ্রম-বিভাজনের ফলে উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। খাদ্য সমস্যার সমাধান হল। বংশবিস্তারের অনুকূল বাতাবরণ তৈরি হল। প্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি নিট ফসল। সংখ্যাগতভাবে এই বৃদ্ধি পাওয়া— স্বাভাবিকভাবে গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিন্যাসে ব্যাপক রদবদলের দাবি নিয়ে হাজির হল। বিভিন্ন পেশার লোকেদের মধ্যে

আন্তঃসম্পর্ক কী হবে, তাদের শ্রমজাত মাল, অন্য পেশার শ্রমজাত মালের সঙ্গে কীসের ভিত্তিতে বিনিময় হবে— এগুলোর মীমাংসা করা জরুরি হয়ে উঠল। অন্যদিকে তখনও ব্যাপকভাবে প্রাকৃতিক আনুকূল্যেই টিকে থাকতে হত বলে এক এলাকার গোচারণ ভূমি শেষ হয়ে গেলে, বা বন্যা, দাবানলে, ভূকম্পে কৃষিখেত ধ্বংস হয়ে গেলে— অন্য এলাকার খোঁজে ছুটতে হত। সেই এলাকা দখলের জন্য অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধও করতে হত। এককথায়: বাস্তব অবস্থা সমাজের সামনে তিনটে আশু সমস্যা সমাধানের দাবি নিয়ে হাজির: ১) অন্তর গোষ্ঠী সমস্যা, ২) আন্তঃ গোষ্ঠী সমস্যা, ৩) প্রকৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব সমাধানের সমস্যা। জন্ম নিল— এথিক্স (আচরণ বিধি), (আইনের ভ্রূণ) যুদ্ধ এবং এগুলোকে সমন্বয় করার জন্য একটা শ্রেণী। সরাসরি উৎপাদনের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ নেই। অন্যের শ্রমের ফলে উৎপাদিত বস্তু (উদ্বৃত্ত) থেকে জীবন নির্বাহকারী একটা শ্রেণী। মনুষ্য-নিরপেক্ষ প্রকৃতির ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে আমদানি হল 'আত্মা'— অতি-প্রাকৃত বস্তু। 'পৃথিবীটা কেমন হলে ভাল হয়'— এই চিন্তা-ভাবনা মুখ্য মানুষের দিক হয়ে ওঠে। শুরু হয় সাধ এবং সাধ্যের দ্বন্দ্ব। সুতরাং 'সাধ এবং সাধ্যের দ্বন্দ্ব এবং তার সমাধান খোঁজা'ই হল এ-যুগের সংস্কৃতির মুখ্য-রূপ। এরকমভাবে আদিম বস্তুবাদী দর্শনের জায়গায় দেখা দিল অবস্তুবাদী দর্শন— যেটা আধুনিক ভাববাদেরই উৎস। সমাজে তৈরি হল এমন একটা সম্প্রদায়— যারা সরাসরি শ্রমের সঙ্গে বিযুক্ত অথচ শ্রমের মালের ভোগদার। শ্রমজীবী মানুষের এই যে শ্রমের ফসলের সঙ্গে বিযুক্তি— এটাই এতদিনকার চলে আসা মানুষে মানুষে গড়ে ওঠা সম্পর্ক থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে তুলল। শ্রমের ফসল হিসাবে সংস্কৃতির বিচ্ছিন্নতা ঘটল (আংশিক)। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধ, পৃথক, সাধ্য, শক্তিও ভিন্ন। সংস্কৃতিতেও এর প্রভাব দেখা দিল। যুদ্ধ, যুদ্ধোত্তর শান্তিপূর্ণ জীবন, শান্তি-বিঘ্নকারী শত্রুকে ঘৃণা করা, উপকারী পশু বা উদ্ভিদের স্তব গাথা— এ সব সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠল। অর্থাৎ বাস্তবের বিকল্প প্রতিচ্ছবিকে ফুটিয়ে তোলাই হল সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম। দর্পণ-প্রতিচ্ছবি নয়।

তবে মনে রাখতে হবে প্রথম দিককার এই যে শ্রেণী বিভেদ— এটা সবে শুরু। তখনও মানুষ আংশিকভাবে হলেও নিজের শ্রমের ফসলের একটা অংশ নিজেরা ভোগ করতে পারত। ফলে সংস্কৃতির গণ-চরিত্রটা প্রথম দিকে বজায় ছিল।

কালক্রমে শ্রম-বিভাগ এবং উৎপাদনের হাতিয়ারের উন্নতির ফলে, সমাজ আরও জটিল অবস্থায় প্রবেশ করে। যারা সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখার জন্য এবং বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য, নির্বাচিত সদস্য ছিল, তারাই সমাজের ঘাড়ে চেপে বসল। সমাজ এবং সামাজিক নিয়মগুলো ভেঙে সমাজের যৌথ-জীবন এবং পারস্পারিক শ্রদ্ধা-সহযোগিতার এথিক্স ভেঙে—সামাজিক সম্পত্তিতে নিজেদের কয়েকজনের অধিকার (বা মালিকানা) স্থাপনের যুক্তি খুঁজতে শুরু করল। এই কাজে আগেই-

পাওয়া-অবসর তাদের প্রচুর সাহায্য করল। মৃত্যু এবং প্রকৃতির রহস্যময়তা থেকে তারা 'শাশ্বত', 'চিরায়ত' ইত্যাদি ধারণা আমদানি করে। আর সেগুলোকেই 'সাধারণ সূত্র' বলে চালাবার চেষ্টা হয়। এর বাস্তব ভিত্তিও ছিল। সাধারণ মানুষ দেখছে— যে নদীর জল তাদের অপরিহার্য, তাদের প্রাণ, সেই নদীই করালমূর্তি ধরে তাদের ধ্বংস করছে। প্রকৃতির এই স্রষ্টা-পালক-সংহারক— তিন রূপের ব্যাখ্যা খুঁজতে তারা ছুটল অন্য মানুষের কাছেই, সমাজ-জীবনের সমস্ত দায়িত্ব (অর্থাৎ, রক্ষা-সালিশি-বণ্টন) তারা যাদের দিয়েছে— তাদেরই দ্বারস্থ হতে হল। প্রকৃতির এই রূপ আগেও ছিল কিন্তু তখন মানুষের মধ্যে এমন কোনও 'প্রতিনিধি' মানুষ তৈরি করে নিতে পারেনি, যার হাতে আছে অবসর সময়, যে-এগুলোকে তুষ্ট করতে পারবে— যা অন্যের মনে হত।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ হিসাবে— অপ্রাকৃত শাশ্বত শক্তির আমদানি হল। সেই শক্তিকেই সমস্ত হেনস্থার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হল। সেই শক্তিকে তুষ্ট করা, সম্মান করা, ভয় করাই হল টিকে থাকার একমাত্র গ্যারান্টি! পূর্বে প্রাকৃতিক-কাজকে, খামখেয়ালিপনা ধরে, প্রকৃতিকেই ভয়, সম্মান, ভালবাসার জায়গা নিল প্রকৃতোর্ধ্ব এক শক্তি। প্রকৃতির বর্ণনার জায়গা দখল করল এক অতি-প্রাকৃতিক শক্তি। বাহুবলে সংহারকে ঠেকানোর স্থলে এল সন্তুষ্ট করা। প্রকৃতিতে এই অবিনশ্বর শক্তির আমদানির প্রতিফলন হিসাবেই সমাজেও এল অবিনশ্বরতার তত্ত্ব। সাংস্কৃতিক জীবনেও তাই। সংস্কৃতি তার চরিত্র হারাতে শুরু করে এই সময় থেকেই— 'একটা শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলেই প্রকৃতি এত শক্তিশালী, তারই অংশ এক শ্রেণীর (মানুষ)। সেই শক্তির অংশ হিসাবে সমস্ত সম্পত্তির মালিক। বাকিরা আপন আপন কর্মসাধনের জন্য সৃষ্টি হয়েছে মাত্র। 'মা-ফলেষু...'।

যদি পৃথিবীর প্রতিনিধিকে সন্তুষ্ট করে, সেই শক্তির ইচ্ছা পূরণ করা যায়— তবেই ইহলোকে ফল লাভ হলেও হতে পারে। মানুষ পূর্বনির্ধারিত জীব, সে কী হবে, না-হবে সে সব আগে থেকেই নির্ধারিত। 'চোখ বাঁধা কলুর বলদ'। এক কথায় বংশানুক্রমিক সম্পত্তি ভোগের সংস্কৃতির সৃষ্টি হল। অন্যভাবে বলতে পারি—সংস্কৃতিও বিচ্ছিন্ন হল তার স্রষ্টাদের কাছ থেকে। সৃষ্টি হল 'অ্যান্টি-সংস্কৃতি'— যার কাজ স্থিতাবস্থা বজায় রাখ। অর্থাৎ মানুষের শ্রমের ফসল আত্মসাৎ করল আর একদল মানুষ। তার সৃষ্টি গান, চিত্র, নাচ, শিল্প, সাহিত্য, এমনকি ভাষাটা পর্যন্ত উৎপাদনের হাতিয়ারগুলোর মতোই আর একদল দখল করে নিল। তাকে বিকৃত করে নিজের অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখার মতো করেই তারা সেটা দখল করে নিল। বাকিদের বোঝাবার চেষ্টা হল— এটাই তাদের জিনিস। ইঁদুর মুনির বরে বাঘ হয়ে কী করেছিল? জন্মরহস্য লোপাটের জন্য মুনিকেই ভক্ষণ করতে উদ্যত হয়েছিল। সংস্কৃতি যে শ্রমের ফসল

এটা লোপাটের জন্য এই সংস্কৃতির প্রধান দর্শন হল শ্রমকে ঘৃণা করা। এরা শ্রম-জাত সব কিছুকেই আত্মসাৎ করতে রাজি কিন্তু তার থেকে শ্রমকে বিযুক্ত করে ঘৃণার বস্তু হিসাবে চিহ্নিতকরণের মাধ্যমেই সেটা করে থাকে। সংস্কৃতির সমস্ত শাখা-প্রশাখার 'অন্তর্বস্তুটা' (কনটেন্ট) এসেছে মানুষের রক্ত-ঘাম-কান্না থেকে, কিন্তু সেখান থেকে বিযুক্তির ফলে, এদের হাতে পড়ে তার আত্মা ধ্বংস হল— বাড়ল জৌলুস (আঙ্গিক) । গরিব ঘরের সুন্দরী বউ বা মেয়ে— নবাবের হারেম-বন্দী হয়ে সোনা-হীরে-পান্না-চুনী-পরা বাইজি! 'অ্যান্টি-সংস্কৃতির' প্রধান লক্ষণ অন্তর্বস্তুকে গৌণ করে আঙ্গিককে গুরুত্বদান। অন্তর্বস্তুতে পরিবর্তন আনা এদের অসাধ্য। তাই কোনও এক মাইকেল কিংবা রিচার্ডসের গান, কিংবা রুনা-স্বপ্নার লোকগীতি শুনলে আমার মনে হারেম-বন্দিনী রূপসী কন্যার কথা এবং এই কন্যার পিতা আমি! একজন পিতার পক্ষে কন্যার এই সালঙ্কারা রূপ যতটা ভাল লাগার কথা ( !) ততটাই ভাল লাগে! থাক, সে তো গেল এক পক্ষের কথা। এরকমভাবে সংগ্রাম শ্রম এবং 'যৌথ' (সমস্ত মানুষের জন্য) গুণাবলি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে সংস্কৃতি একটা বিশেষ শ্রেণীর হাতিয়ার হয়ে উঠল। এই হাতিয়ার দিয়ে ব্যাপক জনগণকে অভিভাবিত বা শর্তাধীন করে তোলা হয়। গেলানো হয়—প্রকৃতোর্ধ্ব বস্তু। সংগ্রামের সংস্কৃতি হল আত্মসাতের সংস্কৃতি। ঠকানোর সংস্কৃতি। লোভ এবং লালসার সংস্কৃতি।

পরাজিত বা বঞ্চিত মানুষের একাংশের কাছ থেকে অনিবার্যভাবে এর বিরোধিতা আসে। অর্থাৎ সমাজ ক্রমশ একটা জটিল সমাধানহীন অন্তর্দ্বন্দ্বে বিভক্ত হয়ে উঠছে। সমস্যাগুলোর আশু সমাধান চায়। বিরোধী শক্তির ধ্বংসই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান। কিন্তু কোনওপক্ষই তখনও পর্যন্ত এমন শক্তি অর্জন করতে পারেনি যে— অন্যপক্ষকে উৎখাত করবে। সমাজ বিকাশের গোটা ইতিহাস পর্ব জুড়ে এই ধ্বংস আর রক্তপাত আমরা দেখতে পাই। বিরোধী পক্ষের দ্বারা সংস্কৃতির ওপর এই ডাকাতি বহু রক্তের চিহ্ন রেখে গেছে। (চার্বাকের হত্যা কি এর নিদর্শন নয়?) সুতরাং সমাধানহীন এই দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য এমন একটা সংগঠনের বা শক্তির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল যেটাকে সমাজোর্ধ্ব বলে চিহ্নিত করা যাবে। অর্থাৎ যার রূপ হবে 'নিরপেক্ষ', যার কাছে সামাজিক মানুষের আত্মসমর্পণ প্রশ্নাতীত হবে। প্রশ্নাতীত করে তোলার জন্যই তাকে 'নিরপেক্ষ' বা সমাজোর্ধ্ব বলে চিহ্নিত করতে হবে। আবির্ভাব হল রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রের আবির্ভাব অনিবার্যভাবে একটা কথা প্রমাণ করে— 'সমাজটা মীমাংসার অতীত স্ব-বিরোধে জড়িয়ে পড়েছে, এমন আপসহীন বৈপরীত্যে ভেঙে পড়েছে যা থেকে মুক্তি লাভে সে অক্ষম। এই বৈপরীত্যগুলো, বিরোধী অর্থনৈতিক স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীগুলো, যাতে নিষ্ফল সংগ্রামে নিজেদের ও সমাজকে গ্রাস না করে রসে, তার জন্য দরকার হয়ে পড়েছিল এমন একটা শক্তি যা দৃশ্যত সমাজের ঊর্ধ্বে দন্ডায়মান, যা

সঙ্ঘর্ষকে নরম করে আনবে, তাকে শৃঙ্খলার সীমানার মধ্যে ধরে রাখবে। সমাজ থেকে উদ্ভূত অথচ সমাজের ঊর্ধ্বে স্বপ্রতিষ্ঠিত এবং ক্রমেই সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলা এই শক্তিই হল রাষ্ট্র।'

সর্বজনগ্রাহ্য সংগঠন হিসেবে রাষ্ট্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই শোষণ এবং শাসনটাও সর্বজনগ্রাহ্য রূপ পেল। সমাজ সংগঠনেও পরিবর্তন এল। শোষকরা সরাসরি নিজেদের রক্ষার ভারটা রাষ্ট্রের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। বণ্টন ব্যবস্থার দায়িত্বটাও তাদের বকলমে রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত হল।

রাষ্ট্রের এই সার্বভৌম রূপ সমাজে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। যেখান থেকে তার জন্ম তাকেই পাল্টাবার কাজে লেগে গেল রাষ্ট্র। শোষক শ্রেণীকে রক্ষণাবেক্ষণ করা, তার অনুকূলে গোটা ব্যবস্থাকে সাজানোই হল রাষ্ট্রের কাজ। এক কথায় রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়াল নিষ্পেষণের এমন একটা যন্ত্র যেটাকে না হটিয়ে মানুষ আর অগ্রসর হতে পারে না। উৎপাদন-বণ্টন ব্যবস্থায় রাষ্ট্র মধ্যস্থতায় নামল— তার সমস্ত নিপীড়নের যন্ত্র নিয়েই। বলাবাহুল্য এর আগেই উৎপাদনের সমস্ত উপকরণগুলোই একটা বিশেষ শ্রেণীর দখলে এসে গেছে। সুতরাং বণ্টনের মূল সূত্র হল— উপকরণের মালিকানা যার উৎপাদিত বস্তুও তার। শ্রমের ফসল হিসেবে উৎপাদিত বস্তুগুলো চিহ্নিত না হয়ে, মালিকের বস্তু হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করল। এবং এগুলো এল রাষ্ট্রের পবিত্রতা এবং নিরপেক্ষতার আবডালে। সুতরাং রাষ্ট্রের আবির্ভাব এবং শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির মুখ্য রূপ হল— একদিকে বশ্যতা অন্যদিকে বিদ্রোহ।' 'সাবজেকশন টু অ্যান অ্যাক্সেপটেড ল' অ্যান্ড অর্ডার' (একটা গৃহীত নিয়মকানুনের কাছে মাথা নত করা)। এর বিরুদ্ধাচরণের মধ্যে আছে চরম পরিণতি এবং এটাকেই প্রথমদিকে গ্রহণ করানো হল, অভ্যাস করানো হল এবং বলাবাহুল্য বাহুবলেই করানো হল। 'বিদ্রোহ হয়ে উঠল পাপের নামান্তর'। বিদ্রোহ এবং জ্ঞানের স্পৃহা 'আদি পাপ' হিসেবে চিহ্নিত হল। স্থিতাবস্থা বজায় রাখার স্বপক্ষে রাষ্ট্রের এই ব্যবহার মানুষের মানসিক গঠনকেও পাল্টে ফেলল। গণ অভিভাবন এক ধরনের মানসিক জাড্য তৈরি করল। এবং ক্রমশ মানুষ 'অ্যান্টি সংস্কৃতিটাই' সংস্কৃতি বলে ভাবতে শিখল। তখন থেকেই শোষণ-বঞ্চনা ভিত্তিক অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখার হাতিয়ার হল এই সংস্কৃতি। সংস্কৃতির শ্রেণী-বিভাজন স্পষ্ট হয়ে উঠল। শোষক শ্রেণীর সংস্কৃতিটাই হয়ে ওঠে সমাজে আধিপত্যকারী সংস্কৃতি।

অন্যদিকে এটা হল লোভ এবং লালসার সংস্কৃতি। দর্শনের জগতে আমদানি হল অদ্বৈতবাদ। যৌথ এবং সমষ্টির জায়গা নিল ব্যক্তি এবং বংশ। 'অমরত্নে'র সন্ধান এবং শ্রেণী শোষণের অধিকারকে চিরায়ত এবং শ্বাশত করতে গিয়ে মরণোত্তর জীবন এবং মোক্ষ লাভের চিন্তা তার মাথায় এসে গেল। উৎস-সন্ধানে ব্রতী হল মানুষ।

কিন্তু 'শাশ্বত' ধারণাকে আঘাত না করে তো আর উৎস-সন্ধান করা যায় না। অর্থাৎ 'শাশ্বত' তার বিরোধী চিন্তার জন্ম দিল। তখন থেকেই শোষক শ্রেণীর মধ্যে থেকেই শোষক শ্রেণী বিরোধী চিন্তার জন্ম। অনড়-অটল বস্তুর উৎস থাকে না, সুতরাং 'গতি' এবং 'পরিবর্তনে'র ধারণার বাস্তব ভিত্তি তৈরি হল। 'নদীতে একই জল দুই বার প্রবাহিত হয় না।' 'চেরির একই ডাল একই ঝড়ে দুইবার দোলে না।'— অর্থাৎ পরিবর্তনশীল প্রকৃতির ধ্যান ধারণা আমদানি হল। মজার ব্যাপার নিজেকে অমরত্ব দেওয়ার জন্য (শাশ্বত চিন্তা) প্রারম্ভিক বস্তু খোঁজার চিন্তা— তাকেই ঠেলে দিল 'পরিবর্তনশীল' ধারণার দিকে। সঙ্ঘাত হয়ে উঠল অনিবার্য। রাষ্ট্র তার 'পবিত্রতা' এবং 'অনড় অবস্থানে'র ধারণাকে বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। শোষক, শোষিত, প্রবন্ধক এবং বঞ্চিত, সমষ্টির ওপর ব্যক্তি এবং বংশের কর্তৃত্ব যেমনটি আছে, এমনটি চিরকাল ছিল। এবং এর বিপরীতে প্রচলিত রাষ্ট্রের এবং ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গতিশীলতা এবং পরিবর্তনশীলতার ধারণা, অনিবার্য সঙ্ঘাতের জন্ম দিল। সংস্কৃতির জগতে নেমে এল রাষ্ট্রের আক্রমণ। প্রথম দিকে এই আক্রমণ মোকাবিলা করার মতো শক্তি নতুন শক্তির ছিল না। তাকে সমর্থন করার জন্য না ছিল একটা জনসমষ্টি, না ছিল প্রয়োগ এবং কলা কৌশলগত উন্নতি। পাশবিক শক্তির আক্রমণে উন্নত চিন্তা চাপা পড়ে গেল। তাদের অপেক্ষা করতে হল ততদিন পর্যন্ত যতদিন না শোষক শ্রেণীর মধ্য থেকে একটা অংশ (বেরিয়ে এসে) তাদের বুদ্ধি এবং বিকাশের জন্য অনুকূল বাতাবরণ তৈরি করে। সুতরাং সঠিক-বেঠিকের সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাস্তববাদের ঊর্ধ্বে প্রক্রিয়া তার জায়গা করে নিল। যে বস্তু ফল দেয় তাই সঠিক, যেটা ফল দেয় না তাই বেঠিক, এটা অনেক ক্ষেত্রে সত্য হলেও সমাজ বিজ্ঞান অর্থাৎ মানুষের প্রগতির ইতিহাসে প্রায়শই সঠিক না-ও হতে পারে। সঠিক চিন্তা এবং উন্নততর সংস্কৃতি পাশবিক শক্তির হাতে সাময়িক পরাজিত হতে পারে, আবার ধ্বংসও হয়ে যেতে পারে।

সংস্কৃতির জগতে এই দ্বন্দ্ব দেখা দেয় আবার মানুষের রোমান্টিক চরিত্রের চিত্রায়ণে। মানুষ ক্লাসিক, না, রোমান্টিক, মানুষের সাধারণ চরিত্র কী এগুলোই শিল্প-সাহিত্য-দর্শনে প্রতিফলিত করার যুগ শুরু হয়। আদিম বাস্তববাদী সংস্কৃতির বস্তুবাদী সংস্কৃতির মধ্যে পুনরুজ্জীব লাভের যুগ এটা। ওদিকে অর্থনীতির জগতে শ্রম বিভাজনের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি নতুন উৎপাদনী উপকরণ উদ্ভাবনের বাস্তব ভিত তৈরি করে। বিনিময় প্রথার ব্যাপকতা, তার স্থানিক এবং পেশাভিত্তিক চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে বাজারের সৃষ্টি করে এবং সাধারণ চরিত্র অর্জন করে। বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম হিসেবে টাকার আবির্ভাব দাবি করে সমতা। ব্যবহারিক দিক থেকে গুণগতভাবে পৃথক দুটো বস্তুর পারস্পরিক বিনিময় তাদের মধ্যে একটা সাধারণ

'গুণ' খোঁজার দিকে ঠেলে দেয়। 'শ্রম' (শক্তি) ছাড়া এই সাধারণ গুণ কী হতে পারে? প্রতটি বস্তুর মধ্যে অন্তর্নিহিত এই বিমূর্ত মানবীয় শ্রমের আবিষ্কার সমাজে 'সব শ্রমই সমান' দাবি আনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে— সেখান থেকেই দাবি ওঠে 'সাম্য'। ছোট ছোট কারিগরি কারখানাগুলো কোথাও একত্রিত হয়ে, কোথাও বা এককভাবে আকারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেগুলোর কাজ চালানোর জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে কাঁচামালের বিরামহীন সরবরাহ এবং শ্রমিক। কিন্তু উৎপাদনের এই দুটো উপকরণের মালিকশ্রেণী (তদানীন্তন কালের) অনবরত এই কাজে বাধার সৃষ্টি করে আসতে থাকে। তারা আবার রাষ্ট্রের দ্বারা সুরক্ষিত, সুরক্ষিত ধর্ম এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্বারা। নতুন উঠতি কারিগরি মালিক এই শ্রেণীটার সঙ্গে অধিষ্ঠিত-মালিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব অনিবার্য সঙ্ঘাতের রূপ নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়।

স্টিম ইঞ্জিনের আবিষ্কার নতুন বণিক শ্রেণীর বিকাশকে আরও ত্বরান্বিত করে। উৎপাদন-উপকরণের এই অভাবিত বিকাশ প্রকৃতিকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা, জানা এবং ব্যবহার করার দাবি নিয়ে হাজির হয়। প্রকৃতিকে 'এক্সপ্লোর' করা, নতুন নতুন রসদ সংগ্রহ করা নতুন এই শ্রেণীটার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

মানুষ এবং মানুষ-নিরপেক্ষ প্রকৃতির সম্পর্ক, বস্তু এবং বস্তু-ঊর্ধ্ব 'আত্মা'র সম্পর্ক, রাষ্ট্র এবং সমাজের সম্পর্ক, প্রচলিত আচরণবিধি, শৃঙ্খলা, সব কিছুকেই 'যুক্তি'র দরবারে সোপর্দ করে যাচাই করার যুগ শুরু হয়। যা কিছু যুক্তিসিদ্ধ নয় তাকেই নাকচ করার কাজে নিযুক্ত হল সমস্ত সাংস্কৃতিক জগৎ। এই সময় থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত সাংস্কৃতিক জগতের ইতিহাস হল শোশক শ্রেণীরই একটা অংশের সঙ্গে অন্য অংশের সঙ্ঘাতের ইতিহাস। প্রতিষ্ঠিত শক্তি (শোষক) বনাম উঠতি শক্তির দ্বন্দ্বের ইতিহাস। একপক্ষের হাতে আছে রাষ্ট্রশক্তি, সমাজকে বাগে-রাখার সমস্ত প্রতিষ্ঠান (চার্চ-সহ) আর ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতি। অন্য পক্ষের সম্বল কেবলমাত্র বিকাশমান একটা অর্থনীতি, নতুন নতুন উৎপাদনী হাতিয়ার। প্রতিষ্ঠিত একটা শক্তিকে পরাজিত করার জন্য, জনমানস তৈরি করাটাই হল সাংস্কৃতিক জগতের কাজ। মনস্তত্ত্বের ভাষায়: প্রজাতিকে রক্ষার জন্য নিজেকে ধ্বংস করার যে শর্তহীন পরাবর্ত সাধারণ প্রাণীর থাকে, সেটাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের অনুকূলে 'পারপাস' 'রিফ্লেক্স' গড়ে তোলাটাই হল সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য।

নতুন বিকাশোন্মুখ এই শোষক শ্রেণীটার সামনে সবচেয়ে বড় বাধা রাষ্ট্রশক্তি। রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল না করে এই বিকাশোন্মুখ শ্রেণীটার অনুকূলে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে গড়া সম্ভব নয় — তাই 'রাষ্ট্রে'র বিরুদ্ধে নয়, রাষ্ট্রকে ব্যবহার করার 'সঠিক' পথের জন্য, প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে আঘাত হানার যুক্তি হাজির হল। এক কথায়: সর্বাত্মক

বিদ্রোহই হল এই যুগের সংস্কৃতি— যার মূল লক্ষ্য রাষ্ট্র ব্যবস্থাটাকে দখল করে এমন একটা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা যেটা নতুন শ্রেণীটার বিকাশের পথে আরও সহায়ক হয়ে উঠবে। পণ্য-উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করবে। পণ্য উৎপাদনের জন্য সহায়ক সমস্ত উপাদানকে যুক্ত করবে। বলাবাহুল্য মুখ্য তিনটে উপাদানের জন্য সহায়ক সমস্ত উপাদানকে মুক্ত করবে। বলাবাহুল্য মুখ্য তিনটে উপাদানের একচেটিয়া অধিকারের ওপর থেকে মুক্তির সংগ্রাম শুরু হল। (১) পণ্যের উৎস কাঁচামালের ওপর থেকে একচেটিয়াপনা (যা এতদিন ভূস্বামীদের হাতে ছিল) ভাঙা; (২) কাঁচামালকে যারা পণ্য বানাবে সেই সমস্ত মানুষের পুরাতন প্রভুদের কর্তৃক থেকে 'মুক্ত' করে নিজেদের কর্তৃত্বে আনা। তৃতীয় উপাদান বাজার তৈরির জন্য অর্থনীতিকে মুক্ত করা। অচলায়তন ভাঙার এই সংগ্রামে: 'মন এবং বস্তু' সমান্তরালবাদ তত্ত্ব পুনরুজ্জীবিত হয়ে ভগবানের অস্তিত্বকে কোথাও সরাসরি কোথাও পরোক্ষভাবে চ্যালেঞ্জ জানাতে শুরু করে। 'ভগবান' এবং 'আত্মা'কেও যুক্তির দরবারে হাজির হয়ে যুক্তিসিদ্ধ হতে হল। আধুনিক গতিবিদ্যার জনক নিউটন হাজির হলেন তাঁর 'বলতত্ত্ব' এবং 'সোলার সিস্টেম' নিয়ে। বলের কার্যকারিতা এবং অনড় বস্তুকে টলাতে গেলে বলপ্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী, প্রকৃতি থেকে এই যুক্তি আহরণ করে নতুন সংস্কৃতি বাজারে আত্মপ্রকাশ করল। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রশক্তি এবং প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই চিন্তার বিরুদ্ধে। নিউটন বললেন : (এই দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে) 'নিউলাস ইন্‌ভারবা'; 'কথায় নয়'। তিনি নতুন হবু-রাষ্ট্র ব্যবস্থার ব্যাখ্যা দিলেন বিজ্ঞানের ভাষায়। তাঁর সৌরমণ্ডলের কার্যাবলির তত্ত্বের মাধ্যমে। বেকনের মধ্যে নতুন এই শ্রেণীর চিন্তা সংহত রূপ পেল। 'শাশ্বত', 'চিরস্থায়ী', 'ভগবান' বা আত্মাকে চ্যালেঞ্জ না জানিয়ে তিনি বুনে দিলেন প্রশ্নের বীজ। 'ভগবান, পৃথিবী বা প্রকৃতিটা যদি সৃষ্টি করেও থাকেন, করুন: কিন্তু সৃষ্টি করে দেবার পর পৃথিবী এবং প্রকৃতিটা চলছে বস্তুগত নিয়মে। অনবরত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে।' ডেকার্তে আরও ভালভাবে বেঁচে উঠলেন বেকনের মধ্যে।

পণ্য সঞ্চালনের নিয়মগুলির আবিষ্কার এবং নতুন শ্রেণীর অনুকূলে 'অর্থনীতি বিজ্ঞানকে' ব্যবহার করা জরুরি হয়ে ওঠে। 'ইকোলজি'র জায়গা নিল ইকনমিকস। আজ পর্যন্ত 'প্রচলিত অর্থনৈতিক' সূত্রগুলোকে 'জালিয়াতের' অর্থনীতি বলে চিহ্নিত করা হয়। কারণ বেনিয়াদের যুগে সম্পদ লাভের সরাসরি উপায় ছিল ঠকানো। ঠকিয়ে মাল কিনে বেশি দামে বিক্রি করাটাই ছিল মুনাফা। 'মুনাফা' লাভের এই অর্থনীতি এবং দর্শন চ্যালেঞ্জড হল। উৎপাদনের উপকরণগুলোর মালিকানার অধিকার উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি আত্মসাৎ করে মুনাফা অর্জনের সূত্রকে কার্যকরী করা এবং নতুন নতুন পণ্য সৃষ্টির জন্য সামাজিক সম্পদের এবং বাজারের সৃষ্টির জন্য অবাধ

প্রতিযোগিতাকে আমদানি করা হয়। এবং এটাকেই স্থিতিশীলতা ভেঙে ফেলে নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত হিসেবে ধরা হয়। গণতন্ত্রের ধারণা বিকশিত হয়। অর্থাৎ শোষক শ্রেণীর অবাধ প্রতিযোগিতার অর্থনৈতিক নীতির রাষ্ট্রনৈতিক রূপের নামই গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্রকে চ্যাম্পিয়ন করাটাই বাকি সমস্ত বিভাগের প্রধান কাজ হয়ে উঠে। ডারউইন তাঁর তাঁর বিবর্তনবাদের তত্ত্ব নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠানিক-অচলায়তনকে এক বিশাল আঘাত হানেন। তাঁর 'যোগ্যতমরাই টিকে থাকে' তত্ত্ব অবাধ প্রতিযোগিতার সমর্থনসূচক আবিষ্কার। [এটাই পরবর্তীকালে নাৎসিবাদের দর্শন হয়ে ওঠে। 'যোগ্যতমরাই টিকে থাকে' তত্ত্ব বিকৃত হয়— 'যোগ্যতমেরই টিকে থাকার অধিকার আছে' তত্ত্বে। সেখান থেকেই আসে— আর্যরাই একমাত্র সুসভ্য এবং যোগ্য, সুতরাং দুনিয়ার মালিকানার অধিকার একমাত্র তাদেরই।]

এককথায়: মানুষের অস্তিত্বকে নির্ধারণ করে থাকে যে কটা উপাদান, যেগুলো সব মিলিয়েই তার সাংস্কৃতিক জীবন, সেই সব কটা উপাদান নিয়ে, নতুন এই শ্রেণীটা পুরনো শোষকদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যার মূল লক্ষ্য— 'জালিয়াতির' অর্থনীতির জায়গায় 'মুনাফার' অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা— (স্মিথ)। এরকমভাবে সমাজে উৎপাদনী ব্যবস্থা এবং সম্পর্কের দ্বন্দ্বের একটা আশু সমাধানে পৌঁছনো। তাই নতুন এই সংস্কৃতি তার সমস্ত সৌরভ থাকা সত্ত্বেও— অন্তর্বস্তুতে মুনাফার সংস্কৃতি বৈ কিছুই নয়।

নতুন এই সংস্কৃতি সরাসরি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে টক্কর করেই নিজের অস্তিত্ব বিশ্বের দরবারে ঘোষণা করে। এরই নাম 'রেনেসাঁ', একটা সাংস্কৃতিক বিপ্লব। বলা যায় ইতিহাসে স্বীকৃত প্রথম সাংস্কৃতিক বিপ্লব যার বর্শামুখটা রাষ্ট্রশক্তির উৎখাতের দিকেই তাক করা ছিল। এটা কোনওক্রমেই নিছক সংস্কারবাদী আন্দোলন ছিল না। সামাজিক-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করে নতুন একটা শ্রেণীর ক্ষমতায় আসার সোপান 'রেনেসাঁ' প্রমাণ করে— যতই কেননা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা থেকে তার জন্ম হোক, একবার জন্মগ্রহণ করে ফেললে সংস্কৃতি নিজেই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাটার গতিপথকে শুধু যে নির্ধারণ করে তাই নয়, পাল্টেও দেয়। 'রেনেসাঁর' ঘাড়ে চেপেই নতুন এই শ্রেণীটা বিশ্বের কোণে কোণে নিজের অশ্বমেধের 'অশ্ব'টাকে পাঠিয়ে দেয়। নিজের প্রতিপক্ষ শ্রেণীকে পরাজিত করে।

সেই সঙ্গে সংগঠিত করে ফেলে আর একটা শ্রেণীকে। এতদিন পৃথিবী এরকম একটা শ্রেণী দেখেনি। অমিত-শক্তিধর অথচ অপরিচিত একটা শ্রেণী। নতুন মালিক এই শ্রেণী উৎপাদন শক্তির সঙ্গে 'মুক্তি' দেয় 'শ্রমিক'কে। [এখানে মুক্তি মানে জন্ম]। সে ইতিহাস বহু রক্তক্ষয়ের ইতিহাস। এক শোষকের জায়গায় আর এক শোষককে অধিষ্ঠিত করার এই ইতিহাস হল সাধারণ মানুষের কামানের খাদ্য হবার ইতিহাস।

সুতরাং নতুনের যাত্রাপথকে প্রভূত করার উপাদানগুলোই হল— সাংস্কৃতিক

জীবন বা সংস্কৃতি। যা কিছু পুরনো দিনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় বা নতুনকে গলা টিপে মেরে ফেলে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চায় তাই হল 'অ্যান্টি-সংস্কৃতি'। মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থান, সম্পর্ক এবং প্রকৃতির সঙ্গে তার ক্রিয়া-বিক্রিয়া থেকে এর উদ্ভব হলেও একবার মূর্ত রূপ পেয়ে গেলে সেগুলি অর্থনৈতিক অবস্থান এবং পারস্পরিক সম্পর্ক পরিবর্তনে নির্ধারক ভূমিকা পালন করে থাকে বলেই অ্যান্টি-সংস্কৃতি স্থিতাবস্থায় স্বপক্ষে তাকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। তাই সংস্কৃতির বিকাশকে সবসময়ই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথেই এগোতে হয়েছে, নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এটা মানুষের পক্ষে অপরিহার্য।

এখন প্রশ্ন নতুন বলতে কি বোঝায়? যা কিছু বিকাশমান তাই নতুন। 'সচেতনতা' নতুন, 'প্রবৃত্তি ক্ষয়িষ্ণু। সচেতন ক্রিয়াকর্মের ওপরে 'প্রবৃত্তি'র জয়লাভের তত্ত্ব— এরই জন্য যতই দাপটে আসুক সেটা পুরাতন। যেমন মধ্যাহ্নের সূর্য যতই দাপটে জ্বলুক না কেন অচিরেই সেটা ডুবে যায়। প্রভাতের সূর্য বিকাশমান। আজকের বিকাশমান শক্তি কালকের ক্ষয়িষ্ণু শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে— যদি না অনবরত সেই শক্তি নিজেকে বিকাশের মধ্যে স্থাপন করতে পারে। অনবরত গতি-পরিবর্তন বিকাশ এবং রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এককথায় দ্বন্দ্বগুলোর (আর্থ-সামাজিক এবং প্রাকৃতিক) সমাধানের মধ্য দিয়েই একটা শক্তি প্রগতির ধারাকে ধরে রাখতে পারে। এই শক্তির বিকাশের অনুকূলে ক্ষেত্র প্রস্তুত করার নামই সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

ইটসেলফ্' অর্থাৎ বস্তুর পরিচয় বস্তু নিজেই। যত বাস্তুবাদীই শোনাক না কেন এ তত্ত্ব— আসলে এটা ভাববাদ। বস্তুর পরিচয় গতিশীলতার মধ্যে। বস্তু মানেই গতি। গতি মানেই বস্তু। এই গতির দ্বন্দ্বে 'থিং-ইন-ইট্‌সেলফ্' (আজকের) কালকের 'থিং-ফর-ইউজ' হয়ে যায়— এগুলি সব ভুলিয়ে দেয় অর্থাৎ প্রতিবাদী দর্শন হিসেবে অজ্ঞেয়বাদ বস্তু-পূজার জন্ম দেয়। এটা 'পণ্য-পূজা'-র পূর্বসূরি।

'স্বাধীনতা', 'গণতন্ত্র', 'পবিত্রতা' সব সংজ্ঞাগুলোকেই মুনাফা ওরিয়েন্টেড করে তোলা হল। ফলে সমাজের প্রগতি আটকে গেল বদ্ধ-জলায়। উৎপাদন ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য এখন আর সামাজিক প্রয়োজনীয়তা নয়— মুনাফা।

সঙ্কুচিত বা অসংগঠিত বাজারের দেশে যেখানে সেখানে মুনাফার জন্য রাষ্ট্রশক্তিকে যথেচ্ছ ব্যবহার করে দুর্নীতির অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হল বুর্জোয়া অর্থনীতি (শুল্ক-হ্রাসের জন্য ঘুষ, এবং স্পিডমানি, বাজার দখলের জন্য ঘুষ ইত্যাদি)। উৎপাদনের সমস্ত উপকরণগুলো কব্জা করে স্লোগান দেওয়া হল শ্রমিকরা তো স্বাধীন। তারাই তাদের শ্রম-শক্তির মালিক। কোথায় খাটবেন, এ স্বাধীনতা তাঁদের আছে। কিন্তু শ্রমের ফসলের মালিক উৎপাদনের উপকরণ যার তিনি অর্থাৎ তাদের 'স্বাধীনতা' আসলে: শ্রমিকদের তাদের জন্য মুনাফা বাড়ানোর স্বাধীনতাতে পর্যবসিত করা। কারণ শ্রম-

শক্তি বিক্রি শ্রমিককে করতে হবে সেটা এক মালিক না হয় অন্য মালিককে। তার শ্রমশক্তির ভগ্নাংশ তাকে ফেরত দেওয়া হয়, বাকিটা মালিক আত্মসাৎ করে। তাই লিঙ্কনের এই 'স্বাধীনতা' চটকদার ভাঁওতা ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্যই শোষক শ্রেণীর কাছে এর অর্থ পরস্পরকে গিলে খাবার 'স্বাধীনতা', লুট করার স্বাধীনতা। 'রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় এল 'গণতন্ত্র'। 'জনগণের দ্বারা', 'জনগণের জন্য', 'জনগণের' রায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধি-মণ্ডলীর দ্বারা শাসনও আসলে এ-রকমই একটা ভাঁওতা। আসলে শ্রমিকের 'স্বাধীনতা' যেমন এক মালিকের পরিবর্তে অন্য মালিক বেছে নেওয়ার 'স্বাধীনতা' মানে একটা 'শেকল' ছেড়ে অন্য 'শেকল', বা শোষিত হওয়ার স্বাধীনতা; (গণতন্ত্র) মানেও তাই, শোষকদের মুখপাত্র কোনও একজনকে বেছে নেওয়ার 'গণতন্ত্র'। এরই নাম বুর্জোয়া গণতন্ত্র। বুর্জোয়াদের এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে সংস্কৃতি আমদানি হল তারই নাম বুর্জোয়া সংস্কৃতি। যে রক্ত, অপচয়, ধ্বংস, ব্যভিচার, সামন্ত এবং চার্চের যুগে রেখে-ঢেকে পর্দার আড়ালে হত এরা সেগুলোকে প্রকাশ্যে নিয়ে এল। সমষ্টির ওপর ব্যক্তির আধিপত্য ঘোষণা এই সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ। শোষকশ্রেণী সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটা শ্রেণীতে রূপান্তরিত হওয়ায়—'ব্যক্তিগুলোর যোগফল হিসাবে' 'সমষ্টি'কে চিহ্নিত করা শুরু হয়। ডাঃ ফাউস্টাসের 'আত্মস্বার্থ', 'আত্মরতি' 'আত্মমুক্তি'ই চরম লক্ষ্য হিসাবে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের নীতি নির্ধারণ করতে শুরু করে। যা আসলে চার্চ এবং সামন্ত প্রভুদের সংস্কৃতিরই পুনরুভ্যুত্থান। সুতরাং আজকের যুগে বসে বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে সামন্ত সংস্কৃতি থেকে পৃথক করা কিংবা তুলনামূলক আলোচনা করে প্রথমটাকে 'প্রগতিশীল', 'জীবনমুখী' আখ্যা দেওয়া, প্রতিক্রিয়াশীলতারই নামান্তর মাত্র। বেকনের 'মন এবং বস্তু' সমান্তরালবাদ তত্ত্ব, 'সমান্তরাল' রেখার তত্ত্ব অনুযায়ীই একটা জায়গায় এসে মিশে গেছে। বিজ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে 'রিজারেকশন' (পুনরুজ্জীবনবাদ তত্ত্ব)।

ওদিকে আরও একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। উদ্বৃত্ত মূল্য (উদ্বৃত্ত-উৎপাদন-জাত) বার বার যে সঙ্কট ডেকে আনছে সেটা সমাধান করার জন্য সামাজিক-বণ্টন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন জরুরি হয়ে পরগাছা, পরশ্রমজীবী শোষকশ্রেণীকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। সমাধানের পথ একটাই— উৎপাদনের সামাজিকীকরণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 'ভোগে'র সামাজিকীকরণ। 'ভোগ'কে সামাজিক চরিত্র দেওয়া। বুর্জোয়াদের পক্ষে এ পথ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু যে মেফস্টফিলিসের ঘাড়ে চেপে সে ভোগের সমুদ্রে লাফ দিয়েছিল, সেই পথই তার ঘড়ে চেপে বসে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। মুনাফার হার ঠিক রাখার জন্য দুটো পথ বেছে নিল— ১) নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে সীমিত করা। ২) উদ্বৃত্তগুলোকে চালান করার জন্য বাজার খোঁজা।

প্রথম কাজটার জন্য প্রয়োজনে স্ব-শ্রেণীর একাংশকে উৎখাত করাটাও তার কাছে নীতি-বহির্ভূত নয় তখন। দ্বিতীয়টার জন্য অন্য দেশ দখল। অর্থনীতির ভাষায় যাকে বলে একচেটিয়াপনা আর শিল্প-সাম্রাজ্যবাদের জন্ম। 'নিজেদের শ্রেণী স্বার্থে'ই

বিরোধী সমস্ত কিছু ধ্বংস করা, 'হত্যা করা', 'পুড়িয়ে দেওয়া' এককথায় নিজেদের সঙ্কট অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার মানসিকতার জন্ম। তাই সামাজিক-সন্ত্রাস চালু করাটাই হল তার সংস্কৃতি। আধুনিক বুর্জোয়ারা হল আসলে সামাজিক-সন্ত্রাসবাদী। উৎপাদন-ব্যবস্থার নৈরাজ্য থেকেই এর জন্ম। এই সময় থেকেই আবার 'প্রবৃত্তি'র জয়গান গাওয়া হতে থাকে। খুন, রাহাজানি, লুণ্ঠনকে মানবিক চরিত্র বলে চিহ্নিত করে তাদের রকম ফেরে ফিরে আসাকে মহিমান্বিত করা হয়। তাই বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং তা থেকে জন্মানো সংস্কৃতিকে সন্ত্রাসের সংস্কৃতি বলে চিহ্নিতও করা যায়। আজ নিকারাগুয়া থেকে ইজরায়েল, আফগানিস্তান থেকে সিংহল— এই সংস্কৃতিরই মূল্য গুনছে।

পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তর দুটো ঘটনা ঘটাল: ১) নিজেদের দেশে প্রতিপক্ষ শ্রেণীটার সঙ্গে আপস করে তাদের সংস্কৃতিকে নতুন মোড়কে হাজির করা। হাজার হাজার বছর ধরে এর প্রভাব থাকার ফলে এটাকেই জাতীয় সংস্কৃতি বলে চালু করা। ২) উপনিবেশগুলোতে সামাজিক বিকাশকে স্তব্ধ করে দিয়ে বাজার তৈরির প্রক্রিয়াটাকে অসম্পূরণ রেখে দেওয়া।

অসংগঠিত বা অবিকশিত বাজার সমৃদ্ধ— এই সমস্ত দেশে সম্পদ লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় কী? রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করা। রাষ্ট্রের তথাকথিত নিরপেক্ষতা এবং পবিত্রতাকে কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্রের ঘাড়ে মালটা গছিয়ে সেটা জনসাধারণকে গিলতে বাধ্য করা। একাজ করানোর জন্য একদল দেশি লোক (রাষ্ট্র ব্যবস্থাতে প্রভাব বিস্তারকারী) খুঁজে বার করে তাকে লভ্যাংশের অংশীদার করে নেওয়া। এরই নাম দুর্নীতি। সম্পদ সৃষ্টি না করে টাকা বা সম্পদ-আহরণকারী একদলের জন্ম। এইরকমভাবে বুর্জোয়া সংস্কৃতি (অর্থনৈতিক কারণে) এই সমস্ত দেখে দুর্নীতির সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। তাই দুর্নীতি একটা সংস্কৃতি যার মূলে আছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক-সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি। এরই জন্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইও করব আবার বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠাও চাইব এটা সেরেফ ভণ্ডামি! জ্বলেজ্বলে মিথ্যা। যেটাকে চকচকে কথার 'সোনালি' বাক্যজালের ঠাস বুনোনিতে গাঁথা হয়েছে। 'জাতীয় সংস্কৃতি', 'বুর্জোয়া সংস্কৃতি' বা 'সংস্কৃতি' বলে যেগুলো চালানো হচ্ছে এসবই আসলে 'প্রবৃত্তির'র জয়গান— অ্যান্টি-সংস্কৃতি। সংস্কৃতির মানুষ থেকে বিযুক্তির ফলে বিকৃত রূপ। অঙ্গসজ্জার চটকদারিত্ব ছাড়া এর আর কিছুই দেওয়ার নেই।

## দুই
## আর এক পিঠ

'থিসিস', 'অ্যান্টিথিসিস' সবই যখন জন্মাল। এবার শুরু 'সিনথিসিসের' যুগ। রাষ্ট্র-পূজা, পুণ্য-পূজার সংস্কৃতি থেকে সংস্কৃতিতে ফিরে যাওয়ার যুগের শুরু হল। কী

হবে সেই সংস্কৃতি? তার বুদ্ধি, বিকাশ এবং রূপান্তরের পথে বাধাই বা কী? কী করেই বা সেই বাধা কাটানো যায়? ইতিহাস এবং মানব-সভ্যতার বিকাশের তত্ত্বে নতুন এক চিন্তা জন্মগ্রহণ করল। সভ্যতা এমন একটা যুগে প্রবেশ করেছে যে যুগটা সভ্যতাকেই চ্যালেঞ্জ করে তার মুখোশটা টেনেহিঁচড়ে খুলে ফেলে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। পণ্য সৃষ্টি করতে গিয়ে বুর্জোয়ারা বিমূর্ত মানবীয় শ্রমগুলো যে সমান অর্থাৎ সব শ্রম সমান তত্ব আবিষ্কার করে ফেলেছে। অবশ্যই এগুলো বিমূর্ত শ্রম। উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি আত্মসাৎ করার অভিপ্রায়েই শ্রমের এই মাহাত্ম্য কীর্তন তাদের করতে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বেশি বেশি করে 'আত্মসাৎ' করার প্রয়োজনে সংগঠিত করে ফেলেছে এই সব শ্রমের আধার শ্রমিককে। তাদের নিঙড়ে নিতে গিয়ে ঠেলে দিয়েছে এক অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে। তারা নিজেরাও পণ্যতে রূপান্তরিত হয়েছে। শ্রমিকের কাছে তার শ্রমশক্তির কোনও ব্যবহারিক মূল্য নেই। শ্রমশক্তির ব্যবহারিক মূল্য থেকে বঞ্চিত শ্রমিকের, শ্রমশক্তির আছে শুধু বিনিময় মূল্য। পণ্যের এই জন্ম-রহস্য (জেনেসিস) ইতিহাসকে নতুনভাবে ভাবতে শেখাল। কারণ ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভুত হয়েছেন সম্পূর্ণ নতুন একটা শ্রেণী। এমন একটা শ্রেণী যাঁদের নেই কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা অথচ সংগঠিত শোষণ করার মানসিকতা শূন্য। পেছনে ফেরার সব নৌকোগুলো ডুবিয়ে দিয়েই এঁরা চলে এসেছেন। এঁরা হলেন সেই 'গফুরের' দল। 'মহেশের' মাথায় লাঠি মেরে গো-হত্যার দায় ঘাড়ে নিয়ে গ্রাম থেকে উৎখাত হয়ে এঁরা 'ফুলবেড়িয়ার' মিলে জীবিকার খোঁজে চলে এসেছেন। এঁদের কোনও পিছুটান নেই— নেই কোনও চাল-চুলো। শেষ সম্পর্ক— 'মহেশকেও শেষ করতে হয়েছে। এক একটা 'গফুর', একই জ্বালা যন্ত্রণা আর উৎখাতের বলি হয়ে একই সঙ্গে একই উৎপাদনী ব্যবস্থার শরিক হয়ে গড়ে তুলেছেন এক সুসংগঠিত বাহিনী। এঁরা একটা শ্রেণী। এঁরা আধুনিক সর্বহারার দল। মানসিকভাবে নির্লোভ। লোভ করার আছেটাই বা কি? থাকবেই বা কেন? কারণ এঁরা যে লোভেরই শিকার। অনবরত আধুনিক যন্ত্রদানবের সঙ্গে লড়তে লড়তে এঁদের মানসিক জড়তা দূর হয়ে গেছে। যন্ত্রের মালিকরা অনবরত তাঁদের রক্ত-ঘাম ঝরিয়েই চলেছেন। নিজের রক্ত-ঘামের ওপর অধিকারও হারিয়ে ফেলেছেন তাঁরা। আধুনিক যন্ত্রপাতি তাঁদের শিখিয়েছে— 'যে কোনও আধুনিক উৎপাদনই হচ্ছে দ্রুত নিষ্পত্তিমূলক। এই উৎপাদন ব্যবস্থা তাঁদের জীবনকে রেখেছে গতিশীল।'

মানসিকভাবে জঙ্গি সামাজিক ইতিহাসে এই একেবারে আধুনিক সুসংগঠিত শ্রেণীটার উদ্ভব সংস্কৃতির জগতে নতুন দাবি উপস্থাপিত করল। পৃথিবীটাকে শুধু ব্যাখ্যা করা নয়, পরিবর্তন করার দাবি। ইতিপূর্বে তাঁদের পূর্বপুরুষরাও পরিবর্তনের জন্য রক্ত ঝরিয়েছেন, অসীম আত্মত্যাগ করেছেন, বহু কষ্ট স্বীকার করেছেন, কিন্তু

পর্বত-প্রমাণ সেই ত্যাগের বিনিময়ে তাঁরা কেবলমাত্র এক শোকের বদলে অন্য আর এক শোষককে ঘাড়ে করে বয়ে বেড়িয়েছেন। এখন প্রয়োজন মৃতের এই বোঝাটাকে ঘাড় থেকে ফেলে মানুষে আবার সেই পারস্পরিক নির্ভরতা আর সহযোগিতার সম্পর্কটাকে পুনরুজ্জীবিত করা। যৌথ ব্যাপারগুলোকে সামাজিক মর্যাদা দেওয়া। এটাই হবে এগিয়ে যাওয়ার সংস্কৃতি। জীবনের স্বপক্ষে দৃপ্ত ঘোষণা। ধ্বংস, রক্ত আর অপচয়ের বিপরীত শব্দ হবে আধুনিক সর্বহারা। তাই অন্বেষণ চললল 'বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ'-এর।

এই সংস্কৃতির পথে প্রধান বাধা কোথায়? শান্তির পথে প্রতিবন্ধক কী? মানুষ কোনওদিন মানুষের শান্তি-বিঘ্নকারী হতে পারে? আধুনিক-সর্বহারা শ্রেণী শিশুসুলভ হার্দিক বিশালতা নিয়েই ভাবতে শুরু করলেন। তাঁদের মনে হল এই যন্ত্রদানবগুলোই যত নষ্টের গোড়া।

শুরু হল যন্ত্র ধ্বংসের যুগ। সেটা ছিল সর্বহারা শ্রেণীর শৈশবের চাপল্য। তাঁদের সেই ছেলেখেলার আঘাতেই আপাত-দৈত্য বুর্জোয়ারা চোখে সরষে ফুল দেখল। সর্বহারা শ্রেণী আরও বেশি করে বুঝতে পারল নিজের (দুনিয়াকে পাল্টে ফেলার) ক্ষমতা।

দুনিয়াটাকে পাল্টে ফেলার ক্ষমতার অধিকারী তাঁরা এই বিশ্বাস অর্জনের জন্য ঐতিহাসিকভাবেই সেই সময় গড়ে উঠল এক সংস্কৃতি... 'অ্যান্টি-সংস্কৃতির' অভিভাবনে মোহমুক্তির সংস্কৃতি। কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকদের জন্ম হল। পরিবর্তন করার কাজটা সামনে রেখে আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে ব্যাখ্যা করার কাজ শুরু হল। সমাজ হয়ে উঠল গবেষণাগার। ইতিহাস রূপান্তরিত হল বিজ্ঞানে। বিজ্ঞানের রূপান্তর ঘটল সংস্কৃতিতে। এতদিন যেন একটা অমিত বিক্রম সিংহ ঘুমিয়ে ছিল... তাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল... অস্ত্রশক্তি দিয়ে; অ্যান্টি-সংস্কৃতির মায়ায়! এই ঘুমিয়ে থাকার সুযোগ নিয়ে তাদের হাতে আর মস্তিষ্কে শেকল পরানো হয়েছে। এখন সময় এসেছে নতুন যুগের 'প্রমিথিউস'-দের জেগে ওঠার। গাত্রাবরণে লেগে থাকা শিশির বিন্দু যেমন লোকে ঝেড়ে ফেলে সেইরকম অবহেলায় এই শেকলকে ঝেড়ে ফেলে অভ্যুত্থানে ফেটে পড়ার সময় এসে গেছে। এই ঘুম ভাঙানিয়া গান গেয়েই নতুন সংস্কৃতির আবির্ভাব—

'রাইজ লাইক লায়নস আফটার স্লাম্বার,
ইন অ্যান আন-ভ্যান্‌কুইশিব্‌ল নাম্বার!
শেক-অফ দ্য চেইন্‌স্ লাইক্ ডিউ
ইন্ স্লিপ হুইচ্ ওয়াজ্ ফলেন আপন ইউ!''

কবির সঙ্গে গলা মিলিয়ে শিল্পী আঁকলেন ছবি। দার্শনিক রাখলেন উদাত্ত আহ্বান 'আজ পর্যন্ত দার্শনিকরা শুধু পৃথিবীটাকে ব্যাখ্যা করে গেছেন... আসল কথা হল এটাকে পাল্টে 'ফেলা'— অতএব সমাজ-বিজ্ঞানী বললেন... 'মোহ ছুঁড়ে ফেল! সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও।' ঐতিহাসিকরা ইতিহাস বিশ্লেষণ করলেন... 'সর্বহারা শ্রেণীরাই পারে একমাত্র অন্যান্য নির্যাতিত শ্রেণীকে নির্যাতনের হাত থেকে মুক্ত করতে। কারণ এটাই ঐতিহাসিক অনিবার্যতা। এই কাজ করতে গেলে এতদিন (হাজার হাজার বৎসর ধরে) শোষক শ্রেণীগুলো যে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে তুলেছে এবং তার থেকে উদ্ভূত যে উপরি সৌধগুলো (সংস্কার, সংস্কৃতি ইত্যাদি) মৃতের বোঝার মতো আজও সর্বহারারা বয়ে চলেছেন সেগুলোকে ঘাড় থেকে নামাতে হবে।' 'ইতিহাস বিবর্তনের গতিপথে যে দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত করেছে সেটা পালনের জন্য তাদের মস্তিষ্ক জগৎকে সম্পূর্ণভাবে সুসজ্জিত করতে হবে নতুন বিশ্ববীক্ষায়'— এটাই হল এ যুগের সংস্কৃতি।

শুরু হল প্রকৃতির নতুন ব্যাখ্যা। বস্তু নিছক বস্তু নয়—প্রক্রিয়া। এতদিন বস্তুকে গতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে গবেষণাগারে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে বিশ্লেষণ করার যে পদ্ধতি চলে আসছিল— তার বিপরীতে একই সঙ্গে অণুবীক্ষণ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে মনুষ্য-নিরপেক্ষ পরিবেশকে দেখার পদ্ধতি আয়ত্ত করল মানুষ। কেবলমাত্র 'অ্যানটমিক্যাল ডিসেকশন' নয়, সঙ্গে সঙ্গে 'ফিজিওলজিকাল রিলেশনে' সমগ্র বস্তুটাকে দেখা। একই সঙ্গে অণুবীক্ষণ এবং দূরবীক্ষণ দিয়ে দেখার ফলে এতদিনকার সীমাবদ্ধতাটা ধরা পড়ল। এতদিন ধরে জঙ্গলকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র গাছকে দেখার যে পদ্ধতি চালু ছিল তার পরিবর্তে জঙ্গলের উপাদান হিসাবে গাছকে দেখার পদ্ধতি চালু হল। 'যুক্তিবাদী'দের খপ্পরে পড়ে এতদিন যেন মানুষ সার্কাসের ক্লাউনের মতো শীর্ষাসনেই হাঁটতে অভ্যস্ত ছিল... কিন্তু নতুন চিন্তা কান ধরে মানুষকে পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিল... মানুষ (চিন্তার জগতে) পায়ের ওপর ভর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। 'মানুষ কেবলমাত্র পেট সর্বস্ব' জীব নয় এটা প্রমাণিত হল অর্ধসত্য ভাঁওতা হিসাবে কারণ বাস্তবে এমন মানুষ দেখাই যায় না যিনি পেটের সমস্যাটাকে উপেক্ষা করে বেঁচে আছেন। 'পেটের' সমস্যা প্রাথমিক গুরুত্ব পেল। সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তার জন্য নিজের এবং প্রজাতির সামগ্রিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সামাজিক সম্পদের সামাজিক ভোগের (বণ্টনের) দাবি... যুগের দাবি হিসাবে উপস্থাপিত হল। এই দাবি অনিবার্যভাবে 'পণ্য পূজা' এবং তার থেকে জন্মানো 'সব রকমের একচেটিয়াপনা'র বিরোধিতার দাবিতে পরিণত হল। 'কনজিউমারইজম'-এর বিরোধিতাই হল যুগের সংস্কৃতি। কারণ 'কনজিউমারইজম' গোষ্ঠী মানুষের বা ব্যক্তি মানুষের স্বার্থে প্রজাতিকে ধ্বংস করতে উদ্যত। ব্যক্তি এবং সমষ্টির সম্পর্ক সম্বন্ধে এতদিন শোষকরা 'সংস্কৃতির'

মাধ্যমে যে ধারণা প্রচার করে আসছিল তা হল— ব্যক্তিগুলোর যোগফলই সমষ্টি (অংশগুলোর যোগফলই সমগ্র) সুতরাং 'ব্যক্তির বিকাশ', 'আত্মোন্নতি', 'ব্যক্তিমুক্তি' ইত্যাদিগুলো সামাজিক সংস্কৃতির প্রধান রূপ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আসছিল। এই প্রথম সঠিকটা বুঝতে গিয়ে বোঝা গেল সমষ্টির উন্নতি এবং বিকাশ কিংবা মুক্তি ব্যতীত ব্যক্তির উন্নতি কিংবা বিকাশ প্রজাতির প্রগতির ইতিহাসে অর্থহীন। 'সমগ্র-প্রজাতি'র জন্য ভাবনা-চিন্তার সংস্কৃতির যুগ শুরু হল।

তাহলে ইতিহাস কী বলে? ইতিহাসে কি এ ধরনের একটা সমাজের সাক্ষ্য মেলে? ঐতিহাসিকরা এবং নৃতত্ত্ববিদরা দেখালেন . . . 'হ্যাঁ, মেলে!' এক সময় ছিল যখন মানুষ 'ব্যক্তি' হিসাবে নিজেকে ভাবতেই পারত না, যূথের অংশ হিসাবে, যূথের কল্যাণে নিয়োজিত এবং উৎসর্গকৃত প্রাণ ছিল সে। তারপর সম্পত্তি, শ্রম বিভাজন এবং পরিবারের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকারের প্রশ্নগুলো এসেছে। সমষ্টির বিনিময়ে ব্যক্তিগতভাবে 'উন্নতি'টা দেখা দিয়েছে। সুতরাং 'হ্যাঁ'টা একটা ঐতিহাসিক পর্যায়েই 'না' হয়েছে। এই 'না' টাকে আবার 'না' করতে হবে— তবেই আসবে আবার 'হ্যাঁ'। কিন্তু এই সমষ্টি জীবনে ফিরে আসাটা নিছক অতীতের পুনরাবৃত্তি নয়। আগের যূথগুলি ছিল 'প্রবৃত্তি' তাড়িত, 'বাধ্যতামূলক'. ... কিন্তু ফিরে আসাটা হবে ... 'সচেতন প্রয়োজন থেকে' 'স্বেচ্ছা-আরোপিত শৃঙ্খলাপূর্ণ!' তাই একেবারে নতুন। ... তাই সমষ্টির স্বার্থকে সবার ওপরে জায়গা দিয়েই, 'প্রবৃত্তির' ওপরে 'সচেতন প্রয়োজনীয়তা'কে জায়গা দিয়েই নতুন সংস্কৃতির জয়যাত্রা শুরু হল। এর মূল কথা: মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হবে শ্রদ্ধা, সহযোগিতার এবং ভ্রাতৃত্বের। দ্বন্দ্ব যা থাকবে সেটা হল বিশ্ব-ব্রহ্মাণের ক্রমবর্ধমান রহস্য বনাম মনুষ্য প্রজাতি। নিজেদের মধ্যে শোষণ, বঞ্চনা, রক্তপাত বন্ধ করেই ... বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের চ্যালেঞ্জ মানুষ গ্রহণ করতে পারে। কেবলমাত্র এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণের মাধ্যমেই ব্যক্তি মানুষের চরম উৎকর্ষতা আসতে পারে।

## ২) সাম্যবাদ ... একটি পরিপূর্ণ বিকশিত সংস্কৃতি

এখন প্রশ্ন এসবের পথে বাধা কোথায়? এই সাংস্কৃতিক জীবন অর্জনের জন্য সংগ্রাম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ দেখল... এটা পেতে গেলে এমন একটা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যার মূল স্লোগান... প্রত্যেকে তার সাধ্যমতো শ্রম দেবে এবং প্রয়োজন মতো পাবে।' কেবলমাত্র এইরকম একটা সমাজব্যবস্থাই পারে মানুষের প্রতিভার দ্বার খুলে দিতে, অমিত-শক্তির আধার হিসাবে বিশ্ব প্রকৃতিতে মানুষকে প্রতিষ্ঠা করতে, বিশ্ব-নাগরিক হিসাবে প্রতিটি মানুষকে গড়ে তুলতে, সব মানুষকে একসঙ্গে গাঁথতে।

লক্ষ্যটা তো বোঝা গেল: তা হলে 'মোক্ষ' লাভের পথে বাধাটা কোথায়? অভিজ্ঞতা থেকেই মানুষ শিখল প্রথম বাধাটা মস্তিষ্ক জগতের জাড্য। শোষক শ্রেণী নিজেদের মুনাফার স্বর্গটা টিঁকিয়ে রাখার জন্য প্রথম দিকে নির্যাতনের মাধ্যমে যে সংস্কৃতিটা (আসলে অ্যান্টি-সংস্কৃতি) গিলিয়েছিল, পরে সেটাই গণ-অভিভাবনের (সাজেশনস) ফলে সংস্কারে পরিণত হয়েছে। ভূত, ভগবান, কর্মফল, মরণোত্তর জীবনে স্বর্গ-প্রাপ্তি এগুলোই অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনোর পথে মানসিক বাধা হিসাবে কাজ করছে। এগুলিকে খতম না করতে পারলে আমূল পরিবর্তনের জন্য অর্থাৎ প্রজাতির সংরক্ষণ এবং প্রগতির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার স্বাভাবিক পরাবর্তটার বিকাশ ঘটবে না। এরই জন্য মস্তিষ্ক জগৎটাকেই নতুন চিন্তাভাবনায় সুসজ্জিত করতে হবে। মস্তিষ্ক জগতে এই আমূল পরিবর্তন সাধনের নামই সাংস্কৃতিক বিপ্লব। এরই জন্য 'বিপ্লব' মানে কেবলমাত্র বৈষয়িক লাভালাভের প্রশ্ন নয়, বিপ্লব মানে আমূল পরিবর্তন, কী সমাজের ক্ষেত্রে কী ব্যক্তির ক্ষেত্রে।

কিন্তু এটা অর্জন করার পথে বাধা কোথায়? ঘরে বসে আত্মানুশীলন করলেই কি এটা অর্জন করা যাবে? না, নতুন সংস্কৃতির জন্য, নতুন আর্থসামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে থেকেই মানুষ নিজের চিন্তা জগতে আমূল পরিবর্তন সাধন করতে পারে। এই ক্রিয়াকাণ্ডের ফলেই মানুষে মানুষে নতুন সম্পর্ক স্থাপন হয়। গড়ে ওঠে নতুন 'এথিক্স', 'দর্শনের' জায়গায় আসে 'বিজ্ঞান'— এগিয়ে চলার গাইড (গাইড টু অ্যাকশন)! 'দর্শন শাস্ত্র' জাদুঘরে ঢোকে। বেঁচে থাকে শুধু বৈজ্ঞানিক সূত্র আর ফর্মাল লজিক। পৃথিবীটাকে পাল্টাতে গিয়েই ব্যক্তি-মানুষ নিজেকে পাল্টে ফেলে। সমষ্টির স্বার্থে কাজে এই রকম ভাবেই ব্যক্তি-উৎকর্ষতার জন্ম হয়। রাজনৈতিক কাজ আর সাংস্কৃতিক কাজ এরকমভাবেই একাকার হয়ে যায়। রাজনীতিবিহীন সংস্কৃতি মানে ধাপ্পা আর সংস্কৃতিবিহীন রাজনীতি হয়ে পড়ে অন্তঃসারশূন্য। ফলে প্রচলিত সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পাল্লা কষেই নতুন সংস্কৃতিকে নিজের পথ তৈরি করে নিতে হয়। তাই সংস্কৃতি কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলমাত্র নয়, নতুন রাজনৈতিক আন্দোলনের স্রষ্টাও বটে। এই কারণেই প্রচলিত ব্যবস্থাটাকে টিকিয়ে রাখতে সবার আগে ব্যবস্থাটার যে শাখা ঝাঁপিয়ে পড়ে... রাষ্ট্র যার নাম— সেটাকে দেখা যায় তৃতীয় এবং সরাসরি প্রধান বাধা হিসাবে। সেই জন্য রাষ্ট্র শক্তিটাকে দুর্বল করে এমন একটা পর্যায়ে আনতে হবে... যার ফলে সেটা উবে যাবে। এই কাজে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা, সংগঠিত করা, এক কথায় জনগণের মধ্যে 'পারপাস রিফ্লেক্স' (লক্ষ্য পরাবর্ত) গড়ে তোলাটাই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মূল কাজ।

## ৩) সীমাবদ্ধতা

তা হলে আগামী দিনের সংস্কৃতি হবে 'বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধে'-র এক সংস্কৃতি। সমগ্র বিশ্বটাই হবে এক রাষ্ট্র। অর্থাৎ একটা সমাজ। এর নাম 'মানব সমাজ'। যেখানে মানুষে মানুষে থাকবে না দ্বন্দ্ব। মানুষ মানুষকে বঞ্চিত করবে না। ধ্বংস, অপচয় আর রক্তপাতের হাত থেকে পৃথিবী হবে মুক্ত। আজকের পৃথিবী সেই যুগের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই আজকের কাজ... আগামী দিনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। এ কাজ একই সঙ্গে, একই আঘাতে সম্পূর্ণ হয় না। এক থালা ভাত তো আর এক গরাসে গেলা সম্ভব নয়। এক এক গরাসেই খেতে হয়। তাই নতুন সংস্কৃতির কোকিলদের বুঝতে হয় যুগের সীমাবদ্ধতা। আর্থসামাজিক সীমাবদ্ধতা। সীমাবদ্ধতাটা বুঝতে পারলেই তবে তাঁরা সীমাবদ্ধতাটার সীমানা কতদূর তা বুঝতে পারেন— সেটার ঊর্ধ্বে নিজেদের তুলতে পারেন। সচেতন ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমে সীমাবদ্ধতাটা অতিক্রম করতে পারেন। নতুন সংস্কৃতির জন্য প্রাথমিক কাজ কোথায় শুরু হতে পারে? সেই সমস্ত দেশে যেখানে প্রচলিত বিশ্ব ব্যবস্থাটা (সাম্রাজ্যবাদ) সব চেয়ে দুর্বল। যেখানে ডাকাতগুলো লুটের মালের বখরা নিয়ে খেয়োখেয়িতে সব চেয়ে বেশি মত্ত। সেখানে মানুষকে আঘাত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে সেখানকার রাষ্ট্র ব্যবস্থাটা এমন একটা শ্রেণীর হাতে সঁপে দেওয়া... যে শ্রেণীটার নেই কোনও উচ্চাভিলাষ, নেই কর্তৃত্ব করার বাসনা, কাউকে বঞ্চিত করার বা শোষণ করার মানসিকতাও তার থাকার কথা নয়। কেবলমাত্র এই রকম একটা শ্রেণীর কর্তৃত্বে রাষ্ট্রটাকে সঁপে দিলে তবেই সামাজিক-ভোগ ব্যাপারটা নিশ্চিত হতে পারে। তাঁরাই, একমাত্র তাঁরাই পারেন রাষ্ট্রটাকে বিকেন্দ্রীভূত করে দুর্বল করে দিতে। সমস্ত রকম একচেটিয়াপনাকে দূর করতে। রাষ্ট্রের প্রধান অবলম্বন স্থায়ী সেনাবাহিনী ভেঙে সমস্ত মানুষের হাতে শান্তির জন্য অস্ত্র তুলে দিতে তাঁরাই পারেন। নিরন্ন, নিরস্ত্র মানুষ কোনও অধিকারই প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। যতই কেন না সে অধিকার তাদের দেওয়া হোক। যেমন শ্রমিককে 'স্বাধীন শ্রমিক' করার অধিকারটা আসলে এক মালিকের বদলে আর এক মালিক বেছে নেওয়ার অধিকার মাত্র। মানুষের পেটে খিদে আর পিঠে বেয়োনেট ধরে 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি হাস্যকর ভাঁওতাবাজি। এটাই বুর্জোয়া গণতন্ত্র। বুর্জোয়া সংস্কৃতি নামান্তরে সামাজিক সন্ত্রাসবাদ। পক্ষান্তরে, সামাজিক ভোগকে নিশ্চিত করে প্রত্যেকটা মানুষের পেটের চিন্তা মুক্ত করতে, স্থায়ী বাহিনীর পরিবর্তে প্রত্যেকটা মানুষকে সশস্ত্র করে অস্ত্রের ভয় থেকে মুক্ত করতে, রাষ্ট্রটাকে দুর্বল করে দিতে— যেটা প্রয়োজন আগেই বলেছি, তার নাম শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব। কোনটা বেশি গণতান্ত্রিক?

কোনটা বেশি করে মানুষের প্রতিভার স্ফূরণ ঘটাতে পারে— এ প্রশ্নটা সমাধান করেই, আজকের সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে।

## ৪) বিপ্লব না প্রতিবিপ্লব

সুতরাং শ্রেণী শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থা থেকে শ্রেণীহীন সাম্যবাদী পর্যায়ে পৌঁছনো পর্যন্ত অনেকগুলো ধাপ পার হতে হয়। এই প্রতিটি ধাপ অতিক্রম করার সময় নানান বাধাবিপত্তি বার বার আক্রমণ করে মস্তিষ্ক জগৎকে আলোড়িত করে। প্রতিটি ধাপে পৌঁছনোর জন্য চরম লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটা সময়োপযোগী সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরি করা— যার উদ্দেশ্য মানুষকে নতুন ব্যবস্থাটার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করা। আবার সেই ধাপে পৌঁছনোর পর সেটাকে টিকিয়ে রাখা এবং সেখান থেকে নতুন করে পৌঁছনোর চেষ্টা করা। কখনই পেছন দিকে ফিরে হা-হুতাশ করা নয়। শোষক শ্রেণী নিজেদের স্বার্থেই সংস্কারগুলোকে কাজে লাগিয়ে বার বার এই কাজটাই করতে চাইবে এবং ব্যতিক্রমহীনভাবে রক্তপাতের মাধ্যমেই তারা পেছনে টেনে নিয়ে যাবে। নিজেদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তারা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগুলো খুঁচিয়ে তোলে— সেগুলোকেই মোক্ষ বলে প্রচার চালায়। 'ব্যক্তি মুনাফা'-র আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় পুনঃ প্রত্যাবর্তনের জন্য দাবি তোলে— 'ব্যক্তি মুক্তি'। সমষ্টির বিপরীতে ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়ে সংস্কৃতি জগতেই তারা আঘাতটা হানে। অনেক সময় বিপ্লবী কর্মীদের একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি তাদের হাতে সুযোগটাও এনে দেয়। বিপ্লবী কর্মীরা নিষ্ঠুরতার মোকাবিলা করতে গিয়ে ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমষ্টিকে ভাবতে যান! ফলে শোষক শ্রেণীর হাতে অস্ত্র তুলে দেন। ব্যক্তি এবং সমষ্টির মাঝে কোনও চীনের পাঁচিল নেই— সমষ্টির স্বার্থ রক্ষাটাই ব্যক্তি স্বার্থকে সব চেয়ে ভালভাবে রক্ষা করতে পারে। নতুন সংস্কৃতিকে তাই 'আত্মস্বার্থ' ধ্বংস করো স্লোগান সামনে রেখেই সমষ্টি এবং ব্যক্তির দ্বন্দ্বের সমাধান করতে হবে। সমাধান করতে হবে প্রবৃত্তি এবং সহজাত-পরাবর্ত বনাম সচেতনতা এবং শর্তাধীন পরাবর্তের দ্বন্দ্বেরও। এ কাজ অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ধৈর্যের কাজ। দুমদাম হাতুড়ির ঘায়ে ভেঙে ফেলার মতো কাজ নয়। হাতুড়ি পিটিয়ে সব কিছু ভেঙে ফেলার জন্য মানসিক প্রস্তুতির এই কাজটাই সাংস্কৃতিক কাজ। সুতরাং পিছিয়ে ফিরে যাওয়ার স্বপক্ষে যে কোনও আন্দোলনই প্রতিবিপ্লব।

রাশিয়া, চীন থেকে রোমানিয়া, জার্মানি সর্বত্রই যা হচ্ছে সেটা হল এটাই। 'শত্রুর শত্রু আমার মিত্র' এটা কোনও প্রগতিশীল বা বিপ্লবীর সংস্কৃতি হতে পারে না। এটা ধান্দাবাজ মুনাফা লুটনেওয়ালাদের সংস্কৃতি। যেহেতু ওই সমস্ত দেশে শাসক গোষ্ঠীগুলো প্রতিক্রিয়াশীল সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে যে কেউ আঘাত হানুক— সেই 'প্রগতিশীল'—

এটা কোনও যুক্তি নয়। সেই 'কেউ'-টা কারা? তারা কি সভ্যতার-সংস্কৃতির গতিপথে উন্‌লম্ফনের প্রস্তুতি নিচ্ছে? না কি আর একটা শোষককেই বসাবার ধান্দা করছে? আজকের দিনে এটা ভাবতে হবে বৈকি! বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করে আমরা দেখেছি সামন্ত সংস্কৃতি আজ বুর্জোয়াদের মধ্যেই (কেবলমাত্র আঙ্গিকের পরিবর্তনের মাধ্যমেই) বেঁচে আছে। সেটা মূলত সামাজিক সন্ত্রাসবাদী সংস্কৃতি। তাই এই সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গড়ে ওঠা সমস্ত বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানই আজ প্রতিক্রিয়াশীলতার আখড়া। তাদের এই সন্ত্রাসমূলক কাজকর্ম নিজের শ্রেণীর অন্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চালাতেও তারা দ্বিধা করে না। এই কাজে তারা জনগণকে কামানের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতে চায়। এটাই এ যুগের 'মোহ'— 'শেকল'।

এই 'মোহ' কাটিয়েই 'আত্মস্বার্থ চূর্ণ হোক।' পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে এগিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়াটাই এ যুগের একমাত্র সংস্কৃতি! যুগোপযোগী সংস্কৃতি! 'আত্মস্বার্থ' কথাটাকেই বুর্জোয়া-সংস্কৃতির ফেরিওয়ালারা 'ব্যক্তি স্বাধীনতা'র আবরণে হাজির করছে। আসলে দুটো শব্দ সমার্থক! ❑